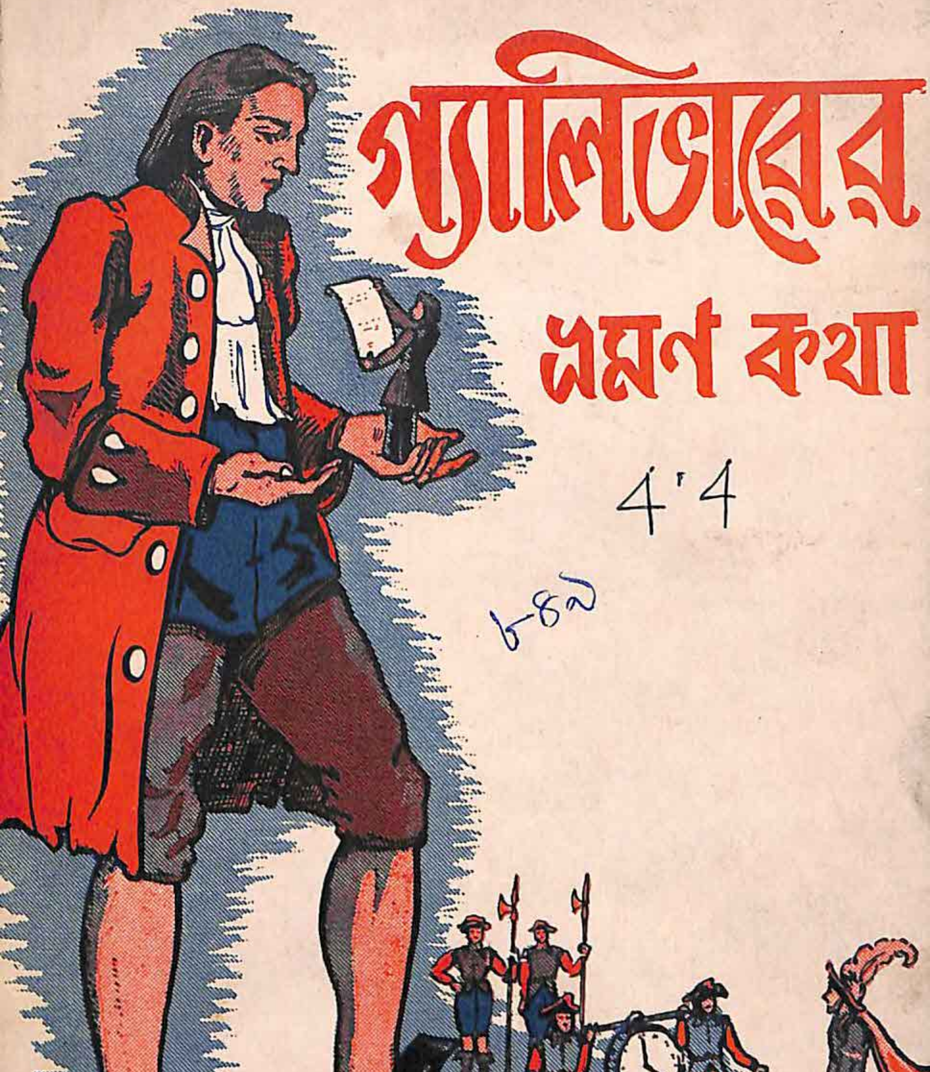
গ্যালিভারের ভ্রমণ কথা



জনাথন সুইফ্‌ট

জোনাথন সুইফ্‌ট্‌-এর

বিখ্যাত

গ্যালিভারের ভ্রমণ কথা

[গ্যালিভার্স ট্রাভেলস্]

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মূল্য ৫·০০

মুদ্রক :
শ্রীঅরুণ রায়
শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫৪/১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

লিলিপুটের দেশে



লেখক পরিচয়

'গ্যালিভার্স ট্রাভেল্‌স্'-এর রচয়িতা **জোনাথন সুইফ্‌ট্**। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে (১৬৫৭) জন্মেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে। সুইফ্‌ট্ জন্মগ্রহণ করবার আগেই তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়। কিন্তু সেজন্য পড়াশুনায় তাঁর অসুবিধা হয়নি কিছু। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের সবচেয়ে ভালো ইস্কুল-কলেজে পড়েছেন। লেখাপড়ায় তিনি ভালো ছেলে ছিলেন এবং তখনকার দিনের অনেক খ্যাতিমান লোকের,—এমন কি, স্বয়ং রাজার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

'গ্যালিভার্স ট্রাভেলস্' লিখে সাহিত্য-জগতে সুইফ্‌ট্ আজও অমর হ'য়ে আছেন। এই কাল্পনিক ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি তখনকার সমাজ-রীতি, জনসাধারণের নীতিজ্ঞান, আদর্শ ও রাজনীতির উপর কটাক্ষপাত করেছেন।

সুইফ্‌ট্-এর গল্প বলার ভঙ্গী এমনই চমৎকার যে, গ্যালিভারের 'লিলিপুটের দেশে' বা 'দৈত্যের দেশে' (ব্রবডিঙ্গনাগ) ভ্রমণটা যেন খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এগুলির মধ্যে যেন আজগুবি কিছুই নেই। ছোট ছেলেমেয়েরা এই কাহিনী দুটি প'ড়ে নিছক গল্প পড়ার আনন্দ লাভ করে থাকে।

গ্যালিভার্স ট্রাভেলস্ প্রথম প্রকাশিত হ'য়েছিল ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই বইয়ের পরবর্তী সংশোধিত সংস্করণ বের হয় মাত্র পাঁচ-ছ বছর পরেই—১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। সভ্য জগতের প্রায় সমস্ত ভাষাতেই এই বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে।

প্রকাশক।

প্রথম খণ্ড

লিলিপুট বা ক্ষুদে মানুষের দেশে

অনুক্রম ঃ

প্রথম অধ্যায়

[লেখক তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের কিছু পরিচয় দিচ্ছেন। দেশ-ভ্রমণে তাঁর আকর্ষণ—কেমন করে তাঁর জাহাজ ধ্বংস হল, তার বর্ণনা। কোন রকমে সাঁতরে তিনি লিলিপুটদের দেশে গিয়ে উঠলেন। তাঁকে বন্দী করে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হ'ল।]

গোড়ার কথা

নটিংহামশায়ারে আমার বাবার সামান্য কিছু জমি-জমা ছিল। আমি ছিলাম পাঁচ ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। চৌদ্দ বছর বয়সে বাবা আমাকে এমানুয়েল কলেজে পাঠিয়েছিলেন—সেখানে আমি তিন বছর বেশ মন দিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। পরে আর্থিক অসুবিধার জন্য আমাকে সেখান হ'তে চলে আসতে হয়।

তারপর চার বছর লণ্ডনের বিখ্যাত চিকিৎসক জেমস, বেটসের কাছে শিক্ষানবিস হ'য়ে থাকলাম। মাঝে মাঝে বাবা টাকা পাঠাতেন—সেই টাকায় নৌ-বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করতাম। ভ্রমণকারীদের পক্ষে এইগুলি শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। আমি সর্বদা বিশ্বাস করতাম যে, কোন না কোনও সময়ে আমার বেড়াতে যাবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই হবে।

বেটসের কাছ থেকে ফিরে বাবার কাছে গেলাম। সেখানে বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সহায়তায় পেলাম চল্লিশ পাউণ্ড। শুধু তাই নয়; লেডেনে থাকার খরচ হিসাবে আরও ত্রিশ

পাউণ্ড পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেলাম। সেখানে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করলাম কিছুদিন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় এর দরকার হবে তা আমি জানতাম।

সমুদ্র-যাত্রা

লেডেন থেকে ফেরার পর আমার শুভানুধ্যায়ী মিঃ বেটসের সুপারিশক্রমে আমি 'সোয়ালো' জাহাজে চিকিৎসকের পদ পাই। তাঁর সঙ্গে সাড়ে তিন বছর লেভাণ্ট ও আরও কয়েকটি জায়গায় যাই।

ফিরে এসে লণ্ডনে থাকাই মনস্থ করলাম। ওল্ড-জুরীর একটি ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে নিউ গেট স্ট্রীটের ব্যবসায়ী মিঃ এডমণ্ড বার্টনের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী মেরীকে বিবাহ করলাম। সেই সঙ্গে যৌতুক পেলাম প্রায় চারশো পাউণ্ড।

দু'বছর পরে আমার হিতৈষী মিঃ বেটস মারা গেলেন। আমার চিকিৎসা ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়লো। কারণ আমার বিশেষ বন্ধু-বান্ধব ছিল না এবং অন্যান্য অনেক চিকিৎসক যে সব গর্হিত উপায় অবলম্বন করেন তা করতে আমার বিবেকে বাধত। সেই কারণে স্ত্রী ও আর কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া স্থির করলাম। পর পর দুখানি জাহাজে করে আমি কয়েকবার পূর্ব ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে আসি। অবসর সময়ে আমি প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকদের বই পড়তাম। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে থাকার সময় নানাজনের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের আচার-ব্যবহার এবং ভাষা শিখতাম। আমার

স্মরণশক্তি ভাল থাকার জন্য ভাষা শেখার কাজটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয় নি।

শেষের দিকের ভ্রমণগুলি তেমন লাভজনক হ'ল না। সমুদ্র সম্পর্কে বীতরাগ হয়ে স্ত্রী এবং পরিজন নিয়ে বাড়ীতে থাকাই ঠিক করলাম।

তিন বছর পরে 'এ্যানটিলোপ' জাহাজের কাপ্তেন উইলিয়াম প্রিচার্ডে'র কাছ হতে দক্ষিণসমুদ্রে যাত্রার একটা প্রস্তাব পেয়ে সেটা গ্রহণ করলাম। ১৬৯৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে আমরা ব্রিস্টল থেকে সমুদ্রযাত্রা করি।

প্রথম দিকের যাত্রা বেশ নিরাপদই হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে এক প্রবল বাত্যার কবলে পড়ে ভ্যান ডিমেন ল্যাণ্ডের উত্তর পশ্চিমে গিয়ে পড়লাম। নাবিকদের মধ্যে বারজন অতিরিক্ত পরিশ্রম ও খাদ্যাভাবে মারা গেল। যারা রইল তাদের অবস্থাও সঙ্গীন।

৫ই নভেম্বর তারিখে কুয়াশার ভেতর নাবিকেরা একটা ছোট পাহাড় দেখতে পেল। বাতাস খুব জোরে বইছিল। আমরা সোজা তার উপর গিয়ে পড়লাম আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানা ভেঙ্গে দুভাগ হ'য়ে গেল।

একখানা নৌকা নামিয়ে আমরা কয়েকজন দাঁড় টেনে চললাম। আধঘণ্টার ভিতর একটা প্রচণ্ড উত্তুরে হাওয়ায় নৌকা গেল উল্টে। সঙ্গীদের অবস্থা কি যে হ'ল কিছুই জানতে পারি নি; বোধ করি তারা মারা গেল। আর আমি ভাগ্যের উপর ভরসা করে সাঁতার কাটতে লাগলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ, যখন বাতাসের বেগ শান্ত

হ'য়ে এসেছে তখন দেখি আমি প্রায় গলা জলে এসে পড়েছি। জলের নীচে ডাঙ্গা তেমন ঢালু ছিল না। তাই প্রায় এক মাইল হাঁটার পর তীরে পৌঁছালাম। আন্দাজ করলাম তখন রাত প্রায় আটটা। আরো আধ মাইল এগিয়ে গিয়েও আমি কোনও বাড়ী বা বাসিন্দার চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারলাম না। অতিরিক্ত গরম, আর জাহাজ ছেড়ে আসার আগে এক পাইট ব্র্যাণ্ডি খেয়েছিলাম, তার ফলে আর ক্লান্তি ও অবসাদের জন্য খুব ঘুম পাচ্ছিল। নরম ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। এমন গভীর ও শান্তিপূর্ণ ঘুম জীবনে কখনও ঘুমিয়েছি বলে মনে হয় না। যখন জেগে উঠলাম তখন সবে ভোর হয়েছে।

লিলিপুটের দেশে

আমি উঠতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও ক্রমেই নড়তে পারলাম না। চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম—দেখি হাত-পা শক্ত করে মাটির সঙ্গে বাঁধা! মাথায় লম্বা চুল ছিল। সেগুলিরও একই অবস্থা। অনুভব করলাম, আমার বগল থেকে উরু পর্যন্ত সমস্ত শরীরে আড়াআড়িভাবে কতকগুলো সরু দড়ি রয়েছে। আমার চারধারে একটা কলরব শোনা যাচ্ছিল—কিন্তু যে অবস্থায় শুয়েছিলাম তাতে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা সম্ভব ছিল না।

কিছু পরে মনে হ'ল জীবন্ত কোনও একটা কিছু আমার বাঁ পায়ের উপর দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে। সেটা প্রায় আমার মুখের কাছে এগিয়ে এল। যতটা সম্ভব চোখ নীচের দিকে নামিয়ে

আমি দেখলাম, সেটা একটা ছ' ইঞ্চি লম্বা মনুষ্য-জাতীয় প্রাণী। তার হাতে তীর-ধনুক আর পিঠে তূণ। ইতিমধ্যে আরও প্রায় চল্লিশটি প্রাণী তার পিছু পিছু এল। সবিস্ময়ে আমি এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম যে তারা সবাই ভয়ে পালিয়ে গেল। পরে শুনেছিলাম আমার পাশ দিয়ে লাফাতে গিয়ে তাদের কয়েকজন বেশ রীতিমত আহতও হয়েছিল। যাই হোক তাদের কয়েকজন শীঘ্রই আবার ফিরে আসল। দু-একজন আমার মুখটা ভাল করে দেখার জন্যে সাহস করে এগিয়ে এল। হাত উপরে উঠিয়ে, চোখ কপালে তুলে কর্কশ অথচ স্পষ্ট স্বরে তারা চিৎকার করে উঠল—'হোকনা ডিগাল।' বাকী সবাই ঐ একই কথা বলে চেঁচিয়ে উঠল। কি-যে তার মানে তা তখন বুঝতে পারি নি।

এতক্ষণ শুয়েছিলাম আমি অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে। মুক্তি পাবার জন্যে নড়াচড়া শুরু করতেই দড়ি ছিঁড়ে গেল আর খোঁটাগুলি উঠে গেল। একটা প্রবল টান দিয়ে যে দড়িগুলি আমার বাঁ দিকের সমস্ত চুল নীচের দিকে বেঁধে রেখেছিল—তা'দের অল্প একটু ঢিলা করে ফেললাম। এতে বেশ একটু ব্যথা পেলাম। কিন্তু মাথাটা ইঞ্চি দুয়েক ঘোরাতে পারলাম। তাদের ধরবার আগেই তারা আবার পালিয়ে গেল। খুব চেঁচামেচি শুরু হল। তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে উঠল—'টোলগো কনাক'। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল একশো তীর এসে আমার গায়ে ছুঁচের মত বিঁধল। বোমা ছোঁড়ার মত আকাশে তারা একরাশ তীর ছুঁড়ল আবার তাদের কতকগুলো আমার মুখের উপর পড়তেই আমি বাঁ হাত দিয়ে মুখখানি তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেললাম।

এর পর আর একবার মুক্ত হ'তে চেষ্টা করায় লোকগুলো আরও বড় এক ঝাঁক তীর ছুঁড়ল। কেউ কেউ আমার পাঁজরায় খোঁচা দেওয়ারও চেষ্টা করতে লাগল। ভাগ্যক্রমে আমার গায়ে একটা মোটা জামা ছিল। সেটা তাদের পক্ষে দুর্ভেদ্য। ভেবে দেখলাম, রাত পর্যন্ত চুপচাপ শুয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাঁ-হাতটা খোলা আছে—রাতের অন্ধকারে বাঁধন খুলে ফেলব। এদেশের লোকজন যদি তাদের বৃহত্তম সেনাবাহিনী আমার বিরুদ্ধে লাগায় তাহ'লে আমি একাই যথেষ্ট—অবশ্য যদি তাদের সকলের আকৃতিই এমন হয়। অদৃষ্ট কিন্তু বিপরীত কাজ করল।

আমাকে শান্ত থাকতে দেখে ওরা আর তীর ছুঁড়ল না। কিন্তু কোলাহলে বুঝলাম ওদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। কিছু পরে দেখলাম আমার থেকে প্রায় চার গজ দূরে দেড় ফুট উঁচু একটা মাচা তৈরী হচ্ছে। তার উপর উঠার জন্য মই লাগান রয়েছে। একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক মই দিয়ে তাতে উঠে আমার উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। মঞ্চে ওঠার আগে তাঁর 'ল্যাং রো ডিহাল সান্' এই আদেশে অনেক লোক এসে আমার মাথার বাঁ দিকের দড়ি কেটে দিল। আমি মাথাটা ঘুরিয়ে এবার লোকটিকে ভাল করে দেখতে পেলাম। লোকটি মধ্যবয়সী ; সঙ্গে তার তিনজন চাকর। একজন তাঁর পোশাকের শেষাংশ ধরে দাঁড়িয়েছিল। বক্তৃতার এক বর্ণ না বুঝলেও তাতে ভীতি প্রদর্শন, প্রতিশ্রুতি, অনুকম্পা ও দয়ার ভাব আমি বুঝেছিলাম।

সূর্যের দিকে বাঁ হাত ও চোখ তুলে তাকে সাক্ষী বুঝিয়ে আমি

সবিনয়ে কয়েকটি কথার জবাব দিলাম। জাহাজ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই আমি কিছু খাই নি। তাই শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হলেও ইসারায় আমি বার বার বুঝলাম যে আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। হুরগো (পরে জেনেছি সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) আমার বক্তব্য বোধ হয় বুঝলেন। মঞ্চ থেকে নেমে এসে আমার চারপাশে কয়েকখানা মই লাগাবার আদেশ দিলেন।

তাঁর আদেশে প্রায় শ-খানেক লোক মই বেয়ে আমার মুখের কাছে মাংসের ঝুড়ি নিয়ে উঠে এল। হরেক রকম মাংস ছিল তাতে—স্বাদে কিছুই বোঝা গেল না। আমার খাবারের বহর দেখে তারা ত অবাক !

এর পর পানীয়ের জন্য ইঙ্গিত করলাম। তারা বুদ্ধিমান; বুঝেছিল—অল্পে হবে না আমার। তাই তাদের সবচেয়ে বড় একটা পিপা দড়ি বেঁধে উপরে তুলে দিল। এক চুমুকে সেটা শেষ করলাম আমি। আর একটি পিপা দিতে সেটিও সাবাড় ক'রে আরও আনবার জন্য ইঙ্গিত করলাম। কিন্তু তাদের তখন আর ছিল না। আমার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি দেখে তারা আনন্দে 'হেকিনা ডিগাল' বলে চিৎকার করে আমার বুকের উপর নাচ শুরু করল। তাদের ইঙ্গিতে আমি পানীয়ের পিপে দু'টো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তার আগে তারা 'বোরাক মিভোলা' বলে নীচের লোকদের সাবধান করে দিয়েছিল।

স্বীকার করতে বাধা নেই—যখন তারা আমার শরীরের উপর দিয়ে যাতায়াত করছিল তখন তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশটাকে ধরে মাটিতে আছড়াবার লোভ হচ্ছিল। কিন্তু সেভাব মন থেকে

সরিয়ে দিলাম। কেন না তাতে তাদের আতিথেয়তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।

কিছুকাল পরে সম্রাটের প্রেরিত একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আমার সামনে রাজকীয় মোহর অঙ্কিত পরিচয়পত্র দেখিয়ে মিনিট দশেক ধরে কি যেন বল্লেন। তাঁর মুখে কোন রকম রাগের চিহ্ন ছিল না। একটা দৃঢ়তার ছাপ ছিল তার মুখে। পরে আমি জেনেছিলাম তিনি বোঝাচ্ছিলেন যে, পরিষদ্‌বর্গের সঙ্গে আলোচনা করে সম্রাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে আমাকে আধমাইল দূরবর্তী রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি ইঙ্গিতে তাকে বোঝালাম যে, আমি মুক্তি চাই। মনে হ'ল তিনি আমার কথা বুঝেছেন। তিনি তার হাতটা নেড়ে এমন ভঙ্গী করলেন যার মানে আমাকে বন্দী হিসাবেই যেতে হবে। সেই সঙ্গে জানালেন যে প্রচুর মদ্য ও মাংস দেওয়া হবে আর সু-ব্যবহারও করা হবে। এই অবস্থায় আমি ইসারা করে জানিয়ে দিলাম যে তারা আমায় নিয়ে যা খুশি করতে পারেন।

একটু পরে শুনলাম 'পেপলোম সেলান' বলে সবাই চীৎকার করছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন এসে আমার বাঁ পাশের বাঁধন আলগা করে দিল। এর পর আমার সর্বাঙ্গে তারা একটা সুগন্ধী মলম লাগিয়ে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তীরের ক্ষত অনেকটা কমে গেল। প্রচুর আহারের জন্য আমার ঘুম এলো। পরে শুনেছিলাম সম্রাটের আদেশে ওদেশের ডাক্তারেরা মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন।

মনে হল ওদেশে পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়ার পর সম্রাট অবিলম্বে

সংবাদ পান, তখনই আমাকে বেঁধে ফেলার হুকুম হয়—আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়; আর রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ীও তৈরী হতে থাকে।

এ সিদ্ধান্ত বিপজ্জনক মনে হতে পারে—ইউরোপে কেউ এর অনুকরণ করবেন না নিশ্চয়ই - তবে আমার মতে ওদের ঐ সিদ্ধান্তটি অতি বিচক্ষণ এবং ওটা যে মহৎ তাতেও সন্দেহ নেই। ওরা যদি আমায় মেরে ফেলার ফন্দী করত—আমি ঘুম থেকে উঠে ওদের কাউকেই ক্ষমা করতাম না।

এখানকার লোকগুলি সুনিপুণ গাণিতিক আর যন্ত্রনির্মাণে কুশলী। সম্রাট স্বয়ং বিদ্যানুরাগী। পাঁচশো ছুতার মিস্ত্রী ও ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে তখনই সবচেয়ে বড় যন্ত্র তৈরী হ'ল। বাইশ চাকার গাড়ি সাত ফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া।

গাড়ীটিকে আমার পাশে সমান্তরাল করে রাখা হল। এক ফুট উচু আশীটি খোঁটা পোতা হয়েছিল—সেই খোঁটার উপর কপিকল লাগিয়ে আমাকে তার উপর তোলা হ'ল। সম্রাটের সাড়ে চার ইঞ্চি বড় পনরশ ঘোড়া গাড়ীটা টেনে আমাকে রাজধানীতে নিয়ে গেল। পথে একটা হাস্যকর দুর্ঘটনায় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

সেখানকার দু-একজন কৌতূহলী যুবক আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় কেমন লাগে দেখার জন্য আমার প্রায় মুখের কাছে আসে এগিয়ে। সৈন্যবাহিনীর একজন তার সড়কিটি আমার বাঁ নাকের ভিতর অনেকখানি ঢুকিয়ে দেয়। নাকে শুড়শুড়ি লাগায় আমি সজোরে হেঁচে উঠি। তারা তখন ভয়ে পালায়। এ-সব কথা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম—কারণ তখন আমি ঘুমে অচেতন।

দিন থাকতে শহরে পৌঁছান গেল না। রাতটা পথেই কাটলো। মশাল আর তীর-ধনুক নিয়ে আমার চারিপাশে রইল প্রায় পাঁচশো রক্ষী।

পরদিন ভোরেই আবার যাত্রা শুরু হল। দুপুরের সময় আমরা রাজধানীর ফটকের দু'শো গজের মধ্যে পৌঁছলাম। সম্রাট ও তাঁর সভাসদ্‌বর্গ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিন্তু পদস্থ কর্মচারীরা বিপদাশঙ্কায় কিছুতেই তাঁকে আমার উপর উঠতে দিলেন না।

যেখানে গাড়ীটা থেমে ছিল সেখানে ছিল সেই রাজ্যের সব চেয়ে বড় একটা প্রাচীন মন্দির। এইখানেই আমাকে রাখা হবে ঠিক হ'ল। এর দরজার মধ্য দিয়ে সহজেই আমি গুঁড়ি মেরে যেতে পারলাম। আমার পা ছিল শিকল দিয়ে বাঁধা। আমার সামনে ছিল বিশাল রাজপথ। হাজার হাজার লোক আমাকে দেখার জন্যে এসেছিল সেখানে!

দ্বিতীয় অধ্যায়

লিলিপুটের রাজা ও তাঁর রাজধানী

উঠে দাঁড়িয়ে তাকালাম আমার চারিধার। দেশটার চতুর্দিক বাগানে ভরা। বনের দীর্ঘতম গাছও মাত্র সাতফুট উঁচু। আমার বাঁ দিকে শহর যেন থিয়েটারের দৃশ্যপট। বাস্তবিক এত মনোরম দৃশ্য এর আগে আমি কখনও দেখি নি।

সম্রাট তোরণ থেকে নেমে আমার দিকে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এলেন। তিনি বেশ পাকা সওয়ার। তার অনুচরেরা এসে ঘোড়ার রাশ ধরল—তিনি নামলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে আমার শরীরের চার ধার তিনি ঘুরে দেখলেন। তাঁর হুকুমে আমাকে খাবার ও পানীয় দেওয়া হ'ল। বিশ গাড়ী মাংস ও দশ গাড়ী মদ নিঃশেষে শেষ করলাম আমি।

সম্রাজ্ঞী এবং রাজকুমার ও রাজকুমারীরাও এসেছিলেন। সম্রাটের বলিষ্ঠ আকৃতি—মার্জিত রুচি এবং বিদ্যোৎসাহিতার জন্য তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর মাথায় সোনা ও মণিমানিক্য খচিত মুকুট। তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হ'ল—কিন্তু আমাদের দুজনের কেউই কিছু বুঝলাম না।

ঘণ্টা দুয়েক পরে সভাসদেরা চলে গেলেন। জনতার বেয়াদবি ও ঈর্ষার হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য আমাকে রাখা হ'য়েছিল কড়া পাহারায়। তা' সত্ত্বেও দু' একজন ধৃষ্টতা করে আমার দিকে

তীর ছুঁড়ল। সেনাপতি মহাশয়ের আদেশে এদের ছ'জনকে সৈন্যেরা বেঁধে উপযুক্ত শাস্তি পাওয়ার জন্য ঠেলে দিল তাদের বর্শা দিয়ে আমার নাগালের ভিতর। আমি তাদের পাঁচ জনকে তুলে পকেটে রাখলাম। আর একটিকে ধরে এমন ভাব দেখালাম যে তাকে আমি জ্যান্ত খাবো। ভীষণ ভয় পেয়ে লোকটি চীৎকার করতে লাগল। আমি কিন্তু লোকটির বাঁধন কেটে তাকে ছেড়ে দিলাম। সে ছুটে পালাল। অন্য সবাইকেও দিলাম ছেড়ে। আমার এই শিষ্টাচারে সবাই খুব সন্তুষ্ট হ'ল। রাজদরবারে এই খবর যাওয়ার পরে আমার অনেক সুবিধা হয়েছিল। প্রায় হপ্তা দুয়েক আমাকে মাটিতে শুয়ে থাকতে হয়। ইতিমধ্যে সম্রাট আমার বিছানা তৈরির আদেশ দিলেন। আমাকে দেখার জন্য লোকেরা এত বেশী আসতে লাগল যে গ্রামগুলো প্রায় খালি হয়ে গেল। তার ফলে কৃষি ও গৃহস্থালির কাজকর্মের গুরুতর অবহেলা হওয়ার ভয় দেখা দিল। রাজা ঘোষণা করলেন একবার যারা আমাকে দেখেছে তারা যেন রাজসভা থেকে ছাড়পত্র ছাড়া আমার বাড়ীর পঞ্চাশ গজের ভেতর না আসে। এর ফলে বেশ কিছু রাজস্ব আদায় হতে লাগল।

ইতিমধ্যে আমাকে নিয়ে কি করা যায় তা আলোচনা করবার জন্য সম্রাট ঘন-ঘন পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন। খুব বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানতে পারি যে সম্রাট আমাকে নিয়ে বিশেষ বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করলেন আমার জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়া বিচিত্র নয়। তারা এ রকমও নাকি ঠিক করেছিলেন যে আমাকে না খাইয়ে মেরে ফেলবেন, কিন্তু এত বড় দেহের পচনের

ফলে মহামারীর আশঙ্কাও ছিল। এমন সময় কয়েকজন সামরিক কর্মচারী সেই ছয়জন অপরাধীর প্রতি আমার সদয় ব্যবহারের কথা সম্রাটকে জানান। সম্রাট ও তাঁর মন্ত্রিবর্গ এতে বেশ সন্তুষ্ট হলেন আর ঘোষণা করলেন—পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রাম আমার খাবার আর পানীয় সরবরাহ করবে। এর জন্য রাজার কোষাগার থেকে তাদের ন্যায্য মূল্য দেওয়া হবে।

আমার কাজ করবার জন্য ছ'শ লোক ও পোশাক তৈরির জন্য তিনশ দরজী নিযুক্ত হ'ল। সম্রাটের ছজন বড় পণ্ডিত আমাকে তা'দের দেশের ভাষা শিখাতে লাগলেন। একুশদিনের মধ্যে ভাষা অনেকটা শিখে নিলাম।

প্রথম কথা শিখলাম—'মহামান্য সম্রাট আমাকে মুক্তি দিন।' অনুমান করলাম তার জবাব হ'ল ধৈর্য ও সদয় ব্যবহার দ্বারা আমি যেন তাঁর ও তাঁর প্রজাদের মনে আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা জন্মাতে পারি।

এর পর সম্রাট আমাকে আমার শরীর তল্লাশ করতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি জানালাম সম্রাটকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত। তিনি বললেন—যে সব জিনিস আমার কাছ থেকে পাওয়া যাবে দেশে যাওয়ার সময় তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, নয়ত উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হবে।

দুজন রাজকর্মচারীকে আমি হাতে তুলে নিয়ে আমার পকেটের মধ্যে পুরলাম। আমার একটা গোপন পকেটের কথা আর জানালাম না—কারণ তাতে আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস ছিল। একটা পকেটে আমার ঘড়ি ও অপর পটেকে

ছিল কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা। ভদ্রলোক দুটি কাগজ কলম নিয়ে সব জিনিসের একটা তালিকা প্রস্তুত করলেন—আর আমাকে সেগুলো নামিয়ে দিতে বললেন—যাতে করে এগুলো তাঁরা সম্রাটকে দিতে পারেন।

সম্রাটের সামনে তালিকাটি পড়া হ'ল। তিনি আমাকে শান্তভাবে সেগুলো দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রথমে চাইলেন তিনি আমার তলোয়ার। তলোয়ারটি খাপ থেকে খুলতেই সৈন্যেরা ভয়ে চীৎকার করে উঠল। সম্রাট কিন্তু নির্ভীক। তিনি ওটা খাপে পুরে মাটিতে রাখতে বললেন।

এরপর চাইলেন আমার পিস্তল। কর্মচারীরা এর বর্ণনা দিয়েছিল একটা লোহার থাম বলে।

আমি সেটি বার করে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করতেই অনেকে মাটিতে হল ধরাশায়ী—সম্রাটও বেশ খানিকক্ষণ পর তবে আশ্বস্থ হলেন।

এর পর দিলাম আমার ঘড়িটা। রাজা এটা দেখে অবাক হলেন। দুজন লম্বা রক্ষী সেটি একটি লোহার রডের মধ্যে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল।

এরপর একে একে আমার মুদ্রাগুলি—আমার ছুরি, চিরুনি, ক্ষুর, রুমাল আর নোটবই সবই দিলাম। আমার গোপন পকেটে ছিল আমার একজোড়া চশমা, সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল ব'লে আর সেকথা সম্রাটকে জানাই নি।

তৃতীয় অধ্যায়

লিলিপুটবাসীর সঙ্গে গ্যালিভারের অন্তরঙ্গতা

আমার নম্র ও ভদ্র আচরণের দ্বারা অচিরেই আমি সেই দেশের সকলের মন জয় করে নিলাম। মনে হল খুব অল্পদিনের মধ্যেই হয়ত স্বাধীনতা মিলবে। আস্তে আস্তে বহু লোক আমার কাছে আসতে লাগল। আমাকে দেখে তারা আর বিশেষ ভয় পেত না। তাদের পাঁচ-ছজনকে আমি হাতে তুলে নিতাম। তারা হাতের উপর নাচ শুরু করে দিত।

সাহস করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে আমার চুলের মধ্যে লুকোচুরি খেলত। এখন আমি তাদের দেশের ভাষায় কথা বলতে ওস্তাদ।

সম্রাট একদিন ইচ্ছা করলেন যে আমাকে তাদের দেশের কয়েকটি খেলা দেখাবেন। বাস্তবিক দড়ির খেলা দেখে যা আনন্দ পেয়েছিলাম তেমনটি আর কিছুতেই পাই নি।

এই খেলা একমাত্র শিখতে পারেন তাঁরাই—যাঁরা উচ্চকর্ম প্রার্থী বা সম্রাটের অতিশয় প্রিয়পাত্র।

একটি উচ্চপদ খালি হ'লে পাঁচছয় জন কর্মপ্রার্থী সম্রাটের কাছে আবেদন করেন। যে সব চেয়ে উঁচু লাফাতে পারে, সেই-ই চাকরিটি পায়। প্রায়ই প্রধানমন্ত্রীরা তাঁদের নৈপুণ্য দেখিয়ে থাকেন সম্রাটের কাছে। তাঁরা যে এখনও এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এটাই তাঁরা জানাতে চান। কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপকে অন্যান্য হোমরাচোমরা

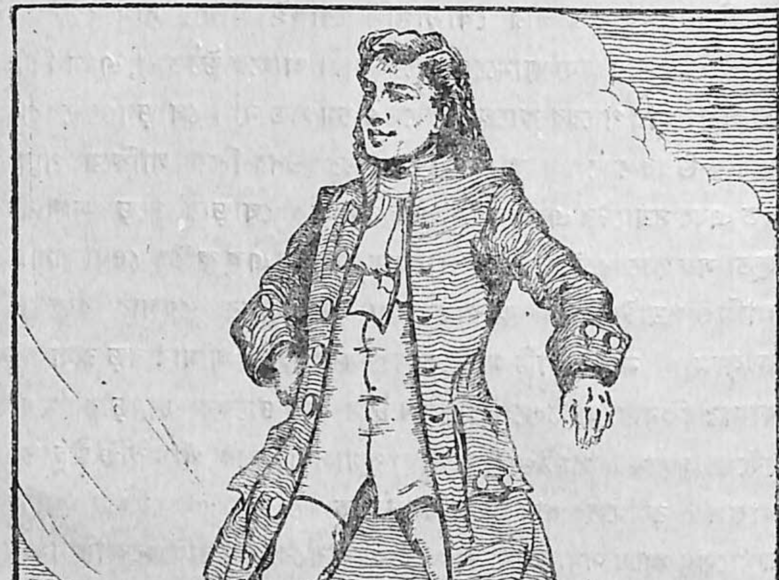
কর্মচারীদের চেয়ে অন্তত এক ইঞ্চি উঁচু একটা সোজা তারের উপর নাচতে বলা হল। আমি তাঁকে কয়েকবার ডিগবাজি খেতে দেখেছি। বে-সরকারী ব্যাপারে রাজার প্রধান সেক্রেটারী এবং আমার বন্ধু রেলড্রেস্যাল আমার মতে এই তারের খেলা দেখানোয় হয়েছিলেন কোষাধ্যক্ষের পরেই অর্থাৎ দ্বিতীয়।

এই সব আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে মারাত্মক দুর্ঘটনা যে না ঘটত এমন নয়—তার অনেক ব্যাপার তালিকাভুক্তও আছে। আমি নিজে দু-তিন জনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যেতে দেখেছি। কিন্তু বিপদটা সব চেয়ে বেশি হয় তখন, যখন মন্ত্রীমশাইরা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাতে আদিষ্ট হন। তাঁরা রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী; কাজেই এই সব শারীরিক কসরৎ দেখানোতেই তাঁদের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তার ফলে অঘটন ঘটে প্রায়ই।

এই ধরনের আর এক রকম আমোদ-প্রমোদ আছে যা কেবল বিশেষ সময়ে সম্রাট, সম্রাজ্ঞী এবং প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখেই দেখানো হয়। সম্রাট তাঁর টেবিলের উপর নীল, লাল ও সবুজ—এই তিন রংয়ের তিনটি সিল্কের ফিতে রাখেন। তারপর একটা লাঠিকে উঁচু-নীচু করা হয়। প্রতিযোগীদের কাজ হচ্ছে—ধা ক'রে যখন যেমন সুবিধা, ঐ লাঠির নীচে দিয়ে গুড়ি মেরে বা উপর দিয়ে লাফ মেরে লাঠিটাকে অতিক্রম করা। যিনি এই কসরৎ দেখানোয় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন তিনি পাবেন নীল ফিতে, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলে লাল এবং সবুজ রংয়ের ফিতে পাবেন যাঁরা তৃতীয় হবেন। সম্রাটের দরবারে এমন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কমই আছেন যাঁর বুকে কোন না কোন রংয়ের সিল্কের ফিতে নেই।

সৈন্যদের ও রাজার ঘোড়াগুলি রোজই আমার সামনে দিয়ে আনা-নেওয়ার জন্য আমাকে দেখে তারা আৎকে উঠত না, এমন কি, তারা আমার পায়ের কাছে আসতেও চমকাত না। ঘোড়সওয়ারেরা মাটির উপর ফেলে রাখা আমার হাতের উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হত এবং সম্রাটের একজন শিকারী মস্ত এক ঘোড়ায় চড়ে আমার জুতা সহ পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে বিশেষ এক কৃতিত্ব দেখালেন। আমিও সম্রাটকে খুশী করবার জন্য এক মজার খেলার ব্যবস্থা করলাম। নয়টা লাঠি মাটিতে শক্ত করে পুঁতে আমার বড় রুমাল-খানার কিনারা লাঠিগুলোর সাথে টান করে ঢাকের চামড়ার মত বেঁধে দিলাম। লাঠিগুলোর মাথা রুমালটা থেকে পাঁচ ইঞ্চি উঁচুতে থাকল। রুমালের ধার দিয়ে একটু উঁচু করে আরও কয়েকটি লাঠি রুমালের সাথে সমান্তরাল করে বেঁধে দিয়ে রেলিং তৈরি করে দিলাম। এর পর রাজার অশ্বারোহী সৈন্যদের কয়েকজনকে ঘোড়াসহ এর উপর তুলে দিলাম। তখন তারা সেই 'মঞ্চের' উপর ঘোড়া ছুটিয়ে নানা রকম খেলা দেখাতে শুরু করল। নানা রকম কুচকাওয়াজ, নকল যুদ্ধ সেখানে দেখে সম্রাট ও তাঁর পারিষদ্‌গণের আনন্দ আর ধরে না। এই খেলা তিনি আরও তিন-চার দিন চালাতে আদেশ দিলেন।

আমার মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন আগে সম্রাটের কাছে খবর এলো—কয়েকজন লোক একটা জিনিস পেয়েছে। জিনিসটি পাওয়া গেছে যেখানে ওরা প্রথমে আমাকে পায়। জিনিসটি বেয়াড়া রকমের। সম্রাটের শয়ন ঘরের মত বড় হবে। তার মাঝখানটা একটা মানুষের সমান উঁচু। অপরের কাঁধে চড়ে



আমার পায়ের নীচে দিয়ে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য চলে গেল

তারা জিনিসটির উপরেও উঠেছিল। ওর উপরটা সমতল এবং ভিতরে ফাঁপা। তাদের ধারণা যে, ঐ জিনিসটি আমার অর্থাৎ ওদের কথায় 'ম্যান মাউণ্টেনের' বা পর্বতাকার মানুষের।

সম্রাট আদেশ দিলে গোটা পাঁচেক ঘোড়ার সাহায্যে তারা ঐ জিনিসটাকে নিয়ে আসতে পারে। কোন্ জিনিসের কথা তারা বলছে তা আমি তৎক্ষণাৎ টের পেয়েছিলাম এবং ঐ জিনিসটি পাওয়া গেছে শুনে আমি খুশী হলাম। আমি ভেবেছিলাম, টুপিটা বুঝি সমুদ্রেই বিসর্জন দিয়ে এসেছি। ডাঙ্গায় উঠার পর আমার কোন হুঁশই ছিল না। সেখানেই যে টুপিটা খুলে পড়েছিল তাও আমি বুঝতে পারি নি। সম্রাটকে ঔ জিনিসটির সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝিয়ে দিয়ে আমি শীঘ্র ওটা আনাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম।

পরদিনই টুপিটা এলো কিন্তু ওটার অবস্থা তখন শোচনীয়। লোকগুলি টুপিটায় ছুটো ফুটো করে তার মধ্যে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে এতটা পথ। ওটা অব্যবহার্য হ'য়ে গেছে তার ফলে।

এর কয়েকদিন পরে সম্রাটের খেয়াল হ'ল, যে সব সৈন্য তাঁর ওখানে আছে, তাদের একদিন মার্চ করে যেতে হবে আমার ছুই পায়ের মাঝখান দিয়ে। তদনুসারে আমি একদিন আমার পা ছুটি যতদূর সম্ভব ফাঁক করে দাঁড়ালাম। আমার পায়ের নীচে দিয়ে হাজার তিনেক পদাতিক এবং হাজার খানেক অশ্বারোহী সৈন্য পতাকা উড়িয়ে ও ঢাক বাজিয়ে চলে গেল।

আমার মুক্তির জন্য সম্রাটের কাছে এতগুলি স্মারকলিপি

ও দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম যে, সম্রাট অবশেষে ব্যাপারটা তাঁর ক্যাবিনেটে এবং পরে কাউন্সিলে পেশ করেন। এখানে একমাত্র 'স্কাইরেশবোল গোলাম' ছাড়া আর কেউ আমার বিরোধিতা করে নি। সুতরাং সমস্ত সভ্যেরা আমার অনুকূলে মত দিলে সম্রাটও তা মঞ্জুর করলেন। ঐ ব্যক্তি অবশেষে জানাল যে, আমার মুক্তির জন্য যে সব চুক্তিনামায় আমায় সই করতে হবে, তা' সে নিজে তৈরি করবে।

কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি ও সেক্রেটারীকে নিয়ে ঐ চুক্তিনামা দেখাবার জন্য একদিন ঐ ব্যক্তি নিজেই আমার কাছে এল। এই চুক্তিপত্রে নয়টি ধারা ছিল। সেগুলি এইরূপ :

১ম :—সম্রাটের বিনা অনুমতিতে আমি ওদের রাজ্য ছেড়ে যেতে পারব না।

২য় :—যে কোনও সময়ে আমি রাজ্যের এই প্রধান শহরে প্রবেশ করতে পারব না। প্রবেশ করবার আগে সময় থাকতে জানাতে হবে যাতে লোকজন সব ঘরের বার না হয়।

৩য় :—আমি রাজ্যের বড় বড় রাস্তায় বেড়াতে পারব কিন্তু মাঠের শস্যক্ষেত্রের মধ্যে বেড়াতে বা শুয়ে থাকতে পারব না।

৪র্থ :—বড় বড় রাস্তায় চলবার সময় আমাকে সাবধান থাকতে হবে,—কোনও প্রজা, গাড়ী-ঘোড়া যাতে চাপা না পড়ে।

৫ম :—কোনও বিশেষ জরুরী চিঠি থাকলে আমি বাধ্য থাকব সম্রাটের পত্র-বাহক ও ঘোড়া পকেটে করে ছ'দিনের রাস্তা চলে যেতে এবং প্রয়োজন মত তাদের নিয়ে আসতে।

৬ষ্ঠ :—ওদের শত্রু—ব্লেফুস্কা দ্বীপের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি সাহায্য করব। তারা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—আমি যেন তাদের যুদ্ধজাহাজগুলি নষ্ট করে ফেলি।

৭ম :—সরকারী কোন কাজে—যেমন বৃহৎ ও ভারী কোনও জিনিস তুলতে বা বহন করে নিয়ে যেতে আমি আমার অবসর সময়ে সাহায্য করব।

৮ম :—মাস দুই সময়ের মধ্যে আমি ওদের রাজ্যের একটা পরিমাপ তৈরি করব। সমুদ্রতীর দিয়ে হেঁটে আমার পায়ের কত পা ওদের রাজ্যের সীমা সেটা আমাকে জানাতে হবে।

৯ম :—আমাকে উপরি-উক্ত বিষয়গুলির জন্য ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করতে হবে। আমি দৈনিক ওদের দেশের ১৭২৮ জনের খাদ্য ও পানীয় পাবো। রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করতে পারবো।

যদিও এই ধারাগুলির মধ্যে কয়েকটি খুব সম্মানজনক ছিল না তবুও আমি খুশী হয়েই শপথ করে এই চুক্তিপত্রে রাজী হলাম।

আমার শৃঙ্খল মুক্ত করা হ'ল। আমি মুক্তি পেলাম। সম্রাট নিজে উপস্থিত থেকে আমার এই মুক্তি দিলেন। আমি সম্রাটকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম।

অনেক পাঠক হয়ত অবাক হ'য়ে ভাববেন, আমার খাদ্যটা ওরা এত সংখ্যা থাকতে—ওদের একজনের খাদ্যের ১৭২৮ গুণ কেন করল! প্রথমটায় আমিও এ জন্য কিছু অবাক হ'য়েছিলাম। পরে আমি খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম সম্রাট ওদেশের অঙ্কশাস্ত্রের

বড় বড় পণ্ডিতদের নিয়ে আমার দেহের পরিমাপের সঙ্গে ওদেশীয়দের দেহের পরিমাপের একটা অনুপাত বের করেন। অঙ্ক কষে তাঁরা স্থির করেন যে, ঐ পরিমাণ খাদ্য আমার পক্ষে প্রয়োজন হবে। এর থেকে ঐ লিলিপুট দেশের লোক কত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তি লাভের পর প্রথমেই আমি অনুরোধ জানালাম যে, আমি রাজধানী মিলডেনডো দেখতে পারি কিনা। সম্রাট সহজেই সেটা অনুমোদন করলেন ; কিন্তু বিশেষ ভাবে কথা থাকল, আমি যেন বাসিন্দাদের অথবা তাদের ঘরবাড়ীর কোন ক্ষতি না করি। শহরের লোকদের আমার শহর দেখতে বা'র হবার সংবাদ পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে প্রাচীর দিয়ে শহরটি ঘেরা, সে প্রাচীরের উচ্চতা আড়াই ফুট এবং চওড়াতে হবে এগার ইঞ্চির কম নয়। কাজেই এই প্রাচীরের উপর দিয়ে ঘোড়া এবং গাড়ী নির্বিঘ্নে ছুটতে পারে। দশফুট অন্তর অন্তর এই প্রাচীরের দু'পাশ থেকে গেঁথে তোলা শক্ত গম্বুজঘর মাথা তুলে তুলে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমদিকের বড় দেউড়িটা আমি ডিঙিয়ে পার হয়ে অতি ধীরে সেটা অতিক্রম করে গেলাম। দুটো সদর রাস্তার মাঝ দিয়ে আমাকে শুধুমাত্র কোমর ঝুল ছোট জামা প'রে কাত হয়ে চল্‌তে হয়েছিল, পাছে, কোট গায়ে চলতে গেলে কোটের দুই প্রান্তভাগের ধাক্কা লেগে রাস্তার দু'ধারের বাড়ী-গুলির ছাদ বা কার্ণিশ ভেঙ্গে যায়। পাছে কোন ছুটকো লোককে পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলি, এই ভয়ে আমাকে অত্যন্ত সাবধানে চলতে হচ্ছিল ; যদিও খুব কড়া হুকুম জারী ছিল যে, কোন লোক বাইরে বা'র হ'লে সে নিজের বিপদ ডেকে আনবে। বাড়ীর ছাদগুলিতে, চিলে কোঠায় এত দর্শকের ভীড় হয়েছিল যে, আমার ভ্রমণ-জীবনে এত লোক আমি আর কোথাও দেখি নি।

শহরটা চারদিকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। প্রত্যেক দিক লম্বায় পাঁচশ ফুট। এই শহরের দুদিক থেকে দুটো বড় রাস্তা এসে মাঝখানে পরস্পরকে ছেদ করে দুদিকে চলে গিয়েছে, তাতে শহরটা হয়ে গেছে সমান চার ভাগ। এই রাস্তা দুটো চওড়ায় পাঁচ ফুট। এই শহরের গলি রাস্তায় বা সরু রাস্তায় আমি প্রবেশ করতে পারি নি। বড় রাস্তা ধরে চলবার সময় আমি ঐ সমস্ত গলি এবং সরু রাস্তা লক্ষ্য করেছিলাম, সেগুলি বার ইঞ্চি থেকে আঠার ইঞ্চির বেশী চওড়া নয়। শহরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক বাস করতে পারে। বাড়ীগুলো সব তিনতলা থেকে পাঁচতলা। শহরে যথেষ্ট সংখ্যক বাজার-হাট ও দোকান-পসার ছিল।

বড় রাস্তা দুটো যেখানে মিশেছে শহরের ঠিক সেই মধ্যস্থলে সম্রাটের প্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের চারদিক দু'ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আর এই প্রাচীর প্রাসাদের পঁচিশ ফুট দূরে। আমি এই প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরে যাবার অনুমতি মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। রাজপ্রাসাদ ও তার প্রাচীরের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি থাকায় আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রাজপ্রাসাদের চারদিক ভাল ভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। রাজপ্রাসাদের বাইরের মহলটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চল্লিশ ফুট এবং তার সঙ্গে আরও দুটো মহল ছিল। একেবারে অন্দর মহলে হচ্ছে মহারাজের বসবাসের ঘরগুলি। আমার ঐ ঘরগুলি দেখবার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। কারণ এক মহল থেকে অপর মহলে যাবার দরজাগুলি আঠার ইঞ্চি উঁচু আর সাত ইঞ্চি মাত্র চওড়া। রাজপ্রাসাদের বাইরের মহলটা অন্তত পাঁচ ফুট উঁচু ছিল, কাজেই আমার পক্ষে বাইরের

মহলের ক্ষতি না করে ঐ মহল ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এদিকে সম্রাটের একান্ত ইচ্ছা আমি তাঁর রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য দেখি, কিন্তু দিন তিনেক আমাকে সে জন্য অপেক্ষা করতে হ'লো। এই তিন দিন, আমি রাজকীয় উদ্যান থেকে, যে উদ্যান শহর থেকে একশত গজ দূরে, সেখান থেকে আমার ছুরি দিয়ে কয়েকটা বড় বড় গাছ কেটেছিলাম। এই গাছগুলি দিয়ে আমার ভার সইতে পারে এমন মজুবত দুটো টুল তৈরি করেছিলাম।

শহরের লোকদের আবার জানানো হল, আমি শহরের রাস্তায় আবার বা'র হবো। সেই সংবাদ প্রচারিত হবার পর আমি আমার তৈরি টুল দুটো দু'হাতে নিয়ে শহরের পথ ধরে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি রাজপ্রাসাদের বাইর মহলের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমার হাতের একটা টুলকে প্রাসাদের সম্মুখে পেতে সেই টুলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে অপর হাতের টুলটাকে তুলে ধরে রাজপ্রাসাদের বাইর ও ভেতর মহলের মাঝখানের আট ফুট চওড়া জায়গাটিতে পাতলাম। তারপর আমি অতি সহজে প্রাসাদ ডিঙিয়ে একটা টুল থেকে অপর টুলটায় উঠে দাঁড়াতে পারলাম এবং প্রথম টুলটাকেও আমি সঙ্গে তুলে নিয়ে গেলাম। ঐ ভাবে আমি অন্দরমহলের দিকে পৌঁছাতে প্যারলাম। আমি শুয়ে পড়ে প্রাসাদের মাঝের তলার জানালায় মুখ রেখেছিলাম। আমাকে প্রাসাদের ভিতরটা দেখাবার জন্য জানালাগুলো সব খোলা ছিল। আমি সেই খোলা জানালা পথে চেয়ে দেখলাম, প্রাসাদের কক্ষগুলি কল্পনাতীত সুন্দর।

বিভিন্ন কক্ষে আমি সম্রাজ্ঞীকে ও রাজপুত্রদিগকে দেখতে পেলাম। তাঁদের প্রধান প্রধান পরিচারকগণ তাঁদের নিকটেই অবস্থান ক'রছিলেন। সম্রাজ্ঞী আমার উপর প্রীত হয়ে মনোরম মৃদুহাস্য করে জানালার ভিতর দিয়ে তার হাত প্রসারিত করেছিলেন, আমি সেই হাত চুম্বন করেছিলাম।

আমাকে স্বাধীনতা দেওয়ার একপক্ষকাল পরে একদিন সকাল বেলা একজন মাত্র চাকর সঙ্গে করে, রেলড্রেসাল, যাকে বলা হ'তো ব্যক্তিগত বিষয়ের মুখ্য কর্মসচিব, আমার বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। তিনি তাঁর গাড়ীখানিকে দূরে রেখে এসে আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক বসে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর গুণ এবং বুদ্ধিমত্তার কথা ভেবে, বিশেষ করে তিনি আমার অনেক উপকার করেছেন বিবেচনা করে, আমি তখনই তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলাম। আমি শুয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিলাম, যাতে, তিনি আমার কাণের কাছে পৌঁছাতে পারেন, কিন্তু তিনি চাইলেন আমি বরং তাঁকে আমার হাতের উপর তুলে ধরি, তা হ'লেই কথাবার্তা বলার সুবিধা হবে। তিনি কথা বলতে আরম্ভ করে প্রথমেই আমার মুক্তি পাওয়ার জন্য আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর জানালেন যে, আমার মুক্তিলাভের ব্যাপারে তাঁর অনেকখানি হাত ছিল এবং আরও জানালেন যে আমার মুক্তি পাওয়া হয়তো এত শীঘ্র ঘটত না যদি নাকি রাজদরবারের বর্তমান অবস্থাটি তাঁর অনুকূল হ'তো।

তিনি জানালেন যে বিদেশীরা আমাদের দেখে খুব সুখৈশ্বর্যশালী বলে মনে করে ঠিকই, কিন্তু আমরা জানি আমাদের খাটতে

হচ্ছে হুটো শক্ত অমঙ্গলের আশঙ্কার মধ্যে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেশের চক্রান্তকারীর দল আর একটি বিদেশী শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা দেশ আক্রান্ত হবার ভয়। প্রথমটা সম্বন্ধে বলতে কি, আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় সত্তরটা চাঁদ গত হয়েছে, হুটো দলে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে, একদল ট্রামেকসান—এরা উঁচু গোড়ালি লাগান জুতা পায়ে দেয়, তাই থেকে তাদের ঐ নাম হয়েছে, আর অপর দলটি, নিচু গোড়ালি লাগান জুতা পরে, তাই তাদের নাম হয়েছে স্লামেকমান। অনেকে অবশ্য অভিমত প্রকাশ করেন বলে শোনা গিয়েছে যে, আমাদের সুপ্রাচীন সংবিধানের সঙ্গে উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা পরিহিতরাই বেশী একমত কিন্তু আমাদের মহারাজ নিচু গোড়ালিযুক্ত জুতা পরিহিত দলটির হাতেই সরকারী সমস্ত কাজকর্ম ন্যস্ত রাখতে এবং রাজ অনুগ্রহের পদগুলিতে তাদেরই বহাল রাখতে একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন কি মহারাজের জুতার গোড়ালি তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের জুতার গোড়ালি থেকে উচ্চতায় অন্ততঃ এক 'ড্রুড়' ছোট। এক 'ড্রুড়' হচ্ছে গিয়ে এক ইঞ্চির চৌদ্দভাগ। এই হুই দলের মধ্যে রেষারেষি এত বেশী যে তাদের একদলের কেউ অপর দলের কারও সঙ্গে পান ভোজন বা বাক্যালাপ পর্যন্ত করে না। সংখ্যার দিক থেকে ট্রামেকসানরা অর্থাৎ উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা পরিহিত দলটি, যাতে আমাদের চেয়ে বেশী না হ'তে পারে, সে দিকে আমাদে দৃষ্টি আছে, কিন্তু ক্ষমতা সেদিক থেকে সম্পূর্ণ ভাবেই আমাদের দিকে। আমরা খানিকটা সন্দেহ করি হয়তো বা যুবরাজের খানিকটা উঁচু গোড়ালির দিকে ঝোঁক আছে,

অবশ্য এটা এখনই পরিষ্কার দেখা যায় যে, তাঁর এক পায়ের জুতার গোড়ালি অপেক্ষাকৃত বড় এবং সেজন্য তিনি একটু খুঁড়িয়েও চলেন।

এখন হয়েছে কি আমাদের এই সব আভ্যন্তরীণ গোলমালের মধ্যে আবার ব্লিফাস্কু দ্বীপের লোকেরা আমাদের দেশকে আক্রমণ করতে আসছে। ব্লিফাস্কু দ্বীপের রাজ্যটাও আমাদের সম্রাটের রাজ্যের মতই বড় এবং তেমনি শক্তিশালী। যাই হোক, তোমার কথা মানতে হলে স্বীকার করতে হয় যে জগতে আরও অনেক রাজ্য ও রাজভক্ত আছে যেখানে তোমার মত বৃহদাকার মানুষরা বাস করে। অবশ্য আমাদের মনীষীরা এই সব বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ পোষণ করেন, এমন কি, তাঁদের ধারণা তুমি হয়তো চাঁদ থেকে নেমে এসেছ, অথবা কোন নক্ষত্র থেকে—কারণ এটা তো নিশ্চিতই যে তোমার মত একশটা মানুষই যথেষ্ট যারা খুব কম সময়ের মধ্যেই সাম্রাজ্যের সমস্ত ফলমাকড় এবং পশুপ্রাণী ধ্বংস করে শেষ করতে পারে। তা ছাড়া আমাদের যে ছ' হাজার চাঁদের সময় কালের ইতিহাস রয়েছে তার কোথাও লেখে না যে লিলিপুট ও ব্লিফাস্কু ছাড়া কোন দেশ আছে। যে দুটো শক্তিশালী সাম্রাজ্য রয়েছে, যাদের কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম তারা এখন থেকে ছত্রিশ চাঁদ পূর্বে অত্যন্ত বেপরোয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। নিম্ন বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরায় সে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল।

এটা আদিকালের ব্যবস্থা হিসাবে সকলেই স্বীকার করতো যে ডিম খাবার পূর্বে তার বড় দিকটাই ভেঙ্গে খেতে হয়; কিন্তু বর্তমান সম্রাটের ঠাকুরদাদা বালক বয়সে পুরাকালীন প্রথামত ডিম ভেঙ্গে খেতে গিয়ে তাঁর একটা আঙ্গুল কেটে

ফেলেছিলেন। যার জন্যে তৎকালীন সম্রাট, তাঁর পিতা, একটা রাজ অনুজ্ঞা সমস্ত প্রজাসাধারণের উপর জারী করেছিলেন। ঐ রাজ অনুজ্ঞায় ডিমের ছোট দিক ভেঙ্গে খাবার নির্দেশ ছিল, অন্যথায় কঠিন শাস্তির কথা জানান হয়েছিল। লোকে এই আইন জারীতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমাদের ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, এর জন্য ছ'বার বিপ্লব ঘটে এবং এই সব বিপ্লবে একজন সম্রাট প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং একজন তাঁর সিংহাসন হারিয়েছিলেন। ব্লিফাস্‌কুর সম্রাটরা প্রজাদের গণ্ডগোল ও অশান্তিতে সর্বদা ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। এই রকম হিসাব পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন সময়ে এই সব গণ্ডগোলে অন্ততঃ এগার হাজার লোক মৃত্যুদণ্ড ভোগ করেছিল তবু তারা ডিমের ছোট দিকটা ভেঙ্গে খেতে রাজী হয় নি। এই বিচারযোগ্য বিষয়টির উপর কয়েক শত মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে—কিন্তু যে সব লেখক ডিমের বড় দিকটা ভেঙ্গে খাবার পক্ষে লিখেছিলেন তাঁদের সে সব বই বহু পূর্বেই নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং ঐ সমস্ত লেখকগোষ্ঠীকে আইনের দ্বারা বেকার করে রাখা হয়।

এই সমস্ত বিপদ যখন চলছিল, তখন ব্লিফাস্‌কুর সম্রাটরা তাঁহাদের দূত মারফত প্রায়ই আমরা ধর্মবিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করছি বলে অভিযোগ করত। আমরা নাকি আমাদের মহান ধর্মপ্রচারক লাসট্রগের ধর্মের মূল তথ্যগুলির ব্যভিচার করেছি। যে তথ্যগুলি আবার ব্লিফাস্‌কু রাজ্যের ধর্মগ্রন্থ ব্রানডিক্রালের চুয়ান্ন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। অবশ্য এটা অনেকেই মনে করেছিলেন যে, ঐ ধর্মগ্রন্থের উপর শুধু শুধুই জোর করে বিষয়টি আরোপ করা হচ্ছে, কারণ সেই

ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে সেটি হচ্ছে এই 'সমস্ত প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিগণই ডিমের সুবিধামত দিকটাই বেছে নেবে ভাঙ্গবার জন্য' এবং আমার সামান্য জ্ঞানে মনে হয় সুবিধামত দিকটি নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজ নিজ বিবেক-বিবেচনার উপর অথবা, অন্ততঃ প্রধান শাসকের ক্ষমতার উপরই সেটা নির্ভরশীল। ডিমের বড়দিকটা ভঙ্গ করা বিধেয় মতাবলম্বীরা দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে ব্লিফাস্কুর সম্রাটের দরবারে অত্যন্ত কৃতিত্ব লাভ করেছিল এবং দেশ থেকে তাদের দলভুক্ত ব্যক্তিগণের কাছ থেকেও তারা অনেক গোপন সাহায্য ও সহানুভূতি বা উৎসাহ পেয়েছিল ; ফলে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল। ঐ যুদ্ধ চলাকালীন আমরা চল্লিশখানি বৃহৎ রণতরী খুইয়েছিলাম এবং এর থেকে অনেক বেশীসংখ্যক ছোটজাহাজ, তার সঙ্গে ত্রিশ হাজার আমাদের উৎকৃষ্ট নাবিক ও সৈনিকদেরও আমরা হারিয়েছিলাম। অবশ্য শত্রুপক্ষের আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। যাই হোক, তারা এখন অনেক রণতরীর বহর সজ্জিত করেছে এবং তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এখনি প্রস্তুত। আমাদের সম্রাট বাহাদুর আপনার শৌর্যবীর্যের উপর বড়ই আস্থাশীল, তিনি আমাকে তাঁর এই ব্যাপারের যথাযথ বিবরণ আপনার গোচরে আনবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।—"আমি ইচ্ছা করেছিলাম কর্মসচিব যেন সম্রাটের প্রতি আমার বিনীত কর্তব্যবোধটুকু তাঁর গোচরে আনেন এবং তাঁকে যেন জানান যে, আমি একজন বিদেশী, আমার উচিত হবে না কোন দলাদলিতে থাকা, কিন্তু, আমি আমার জীবন বিপন্ন করেও তাঁকে রক্ষা করবো এবং আক্রমণকারীদের কাছ থেকে তাঁর রাজ্যকেও রক্ষা করবো।"

পঞ্চম অধ্যায়

ব্লিফাস্কু সাম্রাজ্যটা লিলিপুট সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। আটশ' গজ চওড়া একটা প্রণালি ছুটি দেশকে পৃথক করে রেখেছিল। আমি এই প্রণালি দেখি নি। আমি যখন এই আসন্ন অভিযানের কথা জানতে পারলাম তখন আমি ঐ তীরভূমির দিকে যাওয়া বাদ দিয়েছিলাম পাছে যদি শত্রুর জাহাজ আমাকে দেখতে পায়; তারা তখন পর্যন্ত আমার কোন খবর জানতো না; যুদ্ধের সময় বলে ছুই দেশের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদান করা মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে একেবারেই বন্ধ ছিল।

শত্রুর সমস্ত যুদ্ধজাহাজগুলিকে আটকাবার মতলবের কথা আমি মহামান্য সম্রাটের গোচরে এনেছিলাম। আমাদের সংবাদ সংগ্রহ-কারিগণ আমাদের নিশ্চিতরূপে জানিয়েছিল যে, ঐ সমস্ত জাহাজ তখন লঙর ফেলে পোতাশ্রয়ে অপেক্ষা করছে, সুবাতাস উঠলেই তারা যাত্রা শুরু করবে। আমি খুব অভিজ্ঞ নাবিকদের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে, জোয়ারের সময় ঐ প্রণালির মধ্যখানের জলের গভীরতা সত্তর গ্লামগ্লাফ হয়। ইউরোপের মাপ অনুযায়ী তাতে ক'রে ছ'ফুট দাঁড়ায়, প্রণালির অন্য স্থানের গভীরতা পঞ্চাশ গ্লামগ্লাফের বেশী নয়। এই সমস্ত নাবিকরা প্রণালির গভীরতার মাপ প্রায়ই নিত। আমি ব্লিফাস্কুর বিপরীত দিকে উত্তর-পূর্ব তীরের দিকে হেঁটে পৌঁছেছিলাম এবং একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে শুয়ে পড়ে আমার পকেট থেকে দূরত্ব, আকার ও অবস্থান বোঝবার ছোট

কাঁচখানি বার করেছিলাম এবং নঙর করা শত্রুর জাহাজগুলির দিকে সেই কাঁচের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, ঐ জাহাজগুলির মধ্যে পঞ্চাশখানি যুদ্ধ জাহাজ ছিল এবং অনেকগুলি পারাপারের উপযোগী জাহাজও ছিল।

তারপর আমি বাড়ী ফিরে এসেছিলাম এবং আমার উপর হুকুমনামার বলে আমি কতকগুলি খুব শক্ত দড়ি ও লোহার ডাণ্ডা আনবার জন্য হুকুম দিলাম। দড়ি যা যোগাড় হয়েছিল, সে দড়ি ঠোঙা জড়াবার সুতোর মত মোটা হ'বে, আর লোহার ডাণ্ডাগুলি সেলাইয়ের ছুঁচের মত মোটা। আরও শক্ত করবার জন্য আমি দড়িগুলিকে তিন ফেরতা করে পাকিয়ে নিলাম এবং একই কারণে লোহার দণ্ডগুলিকে তিনটে তিনটে করে নিয়ে পাকিয়ে দুমুখ বড়শির আকারে বেঁকিয়ে রেখেছিলাম। এইভাবে পঞ্চাশটা বড়শি পঞ্চাশটা দড়িতে বেঁধে আমি উত্তর-পূর্ব তীরভূমিতে ফিরে গেলাম এবং আমার জামা, জুতা, মোজা সব খুলে রেখে জোয়ার আসবার আধঘণ্টা পূর্বে চামড়ার পোশাক পরা অবস্থায় জলে গিয়ে নামলাম। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম এবং মাঝখানটায় পৌঁছে গজ ত্রিশেক সাঁতরে গেলাম, তারপর পায়ে মাটি ঠেকেছিল। আমি আধঘণ্টার কম সময়ের মধ্যেই জাহাজগুলির কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলাম।

শত্রুরা আমাকে দেখে এত ভয় পেয়ে গেল যে তারা জাহাজ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে পড়তে লাগল এবং সাঁতার দিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠল। তা সংখ্যায় সে বড় কম নয়, ত্রিশ হাজার হবে বৈকি। তারপর আমি আমার সরঞ্জামাদি নিয়ে প্রত্যেকটি

জাহাজের সামনের গর্তে একটি করে বড়শি বাধিয়ে দিয়ে সব দড়িগুলো এক সঙ্গে করে এক প্রান্তভাগে একটা গিঁট দিয়েছিলাম। যখন আমি এবংবিধ কাজে নিযুক্ত. সেই সময় শত্রুপক্ষ কয়েক হাজার তীর আমার প্রতি নিক্ষেপ করেছিল। অনেকগুলো তীর এসে আমার হাতে মুখে বিঁধেছিল। অত্যন্ত দ্রুত তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমার কাজে অত্যন্ত বাধা সৃষ্টি করেছিল। আমি আমার চক্ষু দুটির জন্য অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলাম। তখন যদি না আমার মাথায় একটি মতলব আসতো তা হ'লে আমি আমার চক্ষুদুটি নিশ্চয়ই সেদিন খোয়াতাম। ছোট ছোট প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে আমি আমার গোপন পকেটে একটি চশমা রেখেছিলাম। আমি পূর্বেই বলেছি, এটিও মহামান্য সম্রাটের নিযুক্ত তল্লাসকারিগণের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। এই চশমাটি পকেট থেকে নিয়ে আমি নাকের উপর শক্ত করে বেঁধেছিলাম এবং এই ভাবে চোখ বাঁচিয়ে আমি সাহসের সঙ্গে কাজ করে গিয়েছিলাম। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর এসে আমার চশমার কাঁচের উপর পড়েছিল কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারে নি।

যখন সমস্ত বড়শিগুলো প্রত্যেকটি জাহাজে বাঁধে হয়েছিল তখন আমি দড়িগুলো একত্রে বাঁধা গিঁটটি ধরে টান দিতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু তাতে জাহাজগুলো একটু নড়ল না, কারণ তারা সব লঙর করে শক্ত করে বাঁধা ছিল। কাজেই আমার যেখানে সাহসের চূড়ান্ত দরকার সেই কাজটুকুই তখনও বাকি পড়ে ছিল। কাজেই আমি দড়ি ছেড়ে দিলাম। বড়শিগুলো জাহাজে জাহাজে আটকেই থাকল। আমি তখন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমার ছুরিখানা দিয়ে লঙরের দড়িগুলো সব কেটে দিলাম। প্রায় দু'শো তীর এসে আমার হাতে

মুখে লাগল। তারপর আর কি, আমি বড়শি বাঁধা দড়ির প্রান্ত-ভাগের গিঁটটি হাতে তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে শত্রুর পঞ্চাশখানি যুদ্ধ জাহাজ টেনে নিয়ে যেতে থাকলাম।

প্রথমে ব্লিফাসকীরা আমার মতলবখানা কি ধরতেই পারে নি। তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে হতভম্বই হয়ে পড়েছিল। তারা আমাকে লঙরের দড়িগুলো কাটতে দেখে ভেবেছিল আমি বোধ হয় জাহাজগুলোকে স্রোতে ভাসিয়ে দিতে অথবা পরস্পরে ধাক্কা-ধুক্কি খাক এই চাইছি। যখন বুঝল সারা বহরটাই একমুখি হয়ে এগুচ্ছে আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে টানছি তখন তারা দুঃখে ও হতাশায় এমন চীৎকার জুড়ে দিল তার বর্ণনা দেওয়া যায় না, ভাবাও যায় না। যখন আমি বুঝলাম বিপদ কেটে গিয়েছে তখন একটু দাঁড়িয়ে আমার মুখে ও হাতে যে তীরগুলো বিঁধেছিল সেগুলোকে বেছে তুলে ফেলেছিলাম এবং আমাকে এই দ্বীপে প্রথম পৌঁছানর পর যে মলমটা লাগাতে দেওয়া হয়েছিল তারই খানিক নিয়ে ঘষে জায়গা-গুলোতে লাগিয়ে দিলাম, আগে যে ভাবে লাগিয়েছিলাম বলেছি ঠিক সেই ভাবে। তারপর আমি আমার চশমা খুলে ফেলেছিলাম এবং ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেছিলাম জোয়ার খানিক নেমে যাওয়ার জন্য। অতঃপর আমি জাহাজের বহর টেনে নিয়ে মাঝখান পার হয়ে নির্বিঘ্নে লিলিপুটের রাজকীয় নৌঘাটিতে হাজির হলাম।

সপারিষদ সম্রাট আমার এই বিপদসঙ্কুল কাজের ফলাফল দেখবার জন্য তীরভূমিতেই দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁরা বহরটাকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন, কিন্তু আমাকে দেখতে পান নি, আমি তো তখন বুকভোর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে। যখন আমি



আমি পঞ্চাশখানা যুদ্ধ জাহাজ টেনে নিয়ে যেতে লাগলাম।

প্রণালিটার মাঝ বরাবর পৌঁছেছিলাম তখন তাঁরা আরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তখন জল আমার গলা পর্যন্ত উঠেছিল, কাজেই সম্রাট বাহাদুর ভেবেছিলেন আমি শেষপর্যন্ত ডুবেই মরেছি এবং জাহাজগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি ভেবেছিলেন তারা বুঝি আক্রমণ করতেই আসছে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর ভয় দূর হয়েছিল, কারণ আমার প্রতি পদক্ষেপেই জল কমে যাচ্ছিল এবং খুব শীঘ্রই আমার কথা শুনতে পাওয়া যায় এত কাছে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার হাতের দড়িগুলো, যা দিয়ে আমি নৌবহরটাকে বেঁধে টেনে নিয়ে এসেছিলাম, সেগুলোকে উঁচুতে তুলে ধরেছিলাম এবং উচ্চ স্বরে ধ্বনি দিয়েছিলাম 'লিলিপুটের সর্বশক্তিমান সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন'। এই মহান রাজা আমি ডাঙ্গায় পৌঁছান মাত্র আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন এবং আমাকে 'নরদক' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। ঐটাই ছিল ওদেশের সকলের পক্ষে সবচেয়ে সম্মানের উপাধি।

মহামান্য সম্রাট ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সুযোগমত আমি যেন শত্রুপক্ষের অবশিষ্ট জাহাজগুলোকেও ধরে নিয়ে এসে তাঁর বন্দরে ভিড়িয়ে দিই। এই সমস্ত রাজরাজড়াদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আর পরিমাপ করা যায় না। তিনি তখন ব্লিফাস্কু সাম্রাজ্যটাকে কি করে তাঁর একটা প্রদেশে পর্যবসিত করা যায় সেই চিন্তাই করছিলেন, এর কমে যেন তিনি আর সন্তুষ্ট নন্। ডিমের বড়দিক ভাঙ্গার পক্ষপাতী দেশ থেকে বিতাড়িত দলটিকে তিনি সমূলে ধ্বংস করবেন এবং সকলকে তিনি ডিমের ছোট দিকটা ভেঙ্গে খাবার মতে নিয়ে আসবেন এবং এইরূপে তিনি সারাবিশ্বের একমাত্র সম্রাটরূপে বিরাজ করবেন—এই চিন্তাই

তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। আমি কিন্তু চেষ্টা করলাম তাঁর মতলবটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য অনেক তর্ক ও ন্যায়নীতির কথা পেড়ে এবং আমি একথা বলেও আপত্তি জানিয়েছিলাম যে, আমি একটা সাহসী বীর স্বাধীন জাতকে দাসত্বে আনবার যন্ত্র স্বরূপ হতে পারব না এবং যখন বিষয়টি নিয়ে রাজপরিষদে আলোচনা হলো তখন মন্ত্রিসভার অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই আমার মতের সপক্ষে মত দিয়েছিলেন।

আমার মতের প্রকাশ্য দৃঢ় অভিব্যক্তিটা মহামান্য সম্রাটের চিন্তা এবং রাজনীতির এতই পরিপন্থী হয়েছিল যে তিনি তা ক্ষমা করতে পারেন নি। তিনি বেশ চাতুর্যের সঙ্গে সেটা পরিষদে উত্থাপন করেছিলেন এবং আমি শুনেছিলাম যে বিজ্ঞব্যক্তিদের কেউ কেউ আমার মতই পোষণ করেছিলেন এবং সেটা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের নিরুত্তর থাকা থেকে, কিন্তু অপর অনেকে যারা আমার এযাবৎ গোপন শত্রুতা করেছিল তারা আমার বিরুদ্ধে ছু'চার কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারে নি। এই সময় থেকে সম্রাটকে নিয়ে একদল মন্ত্রী যারা আমার ক্ষতিসাধন করতে ব্যগ্র ছিল, তারা আমার বিরুদ্ধে গোপন শলাপরামর্শে লিপ্ত হয়েছিল। ষড়যন্ত্র ছু'মাসের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং এই ষড়যন্ত্রের ফলে আমি একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারতাম। রাজরাজড়াদের যত উপকারই করা হোক, তার কোন গুরুত্ব নেই যদি তাদের বাসনা চরিতার্থ করতে একবারও অস্বীকার করা হয়।

এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ব্লিফাস্কু রাজ্য থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে একটি শান্ত গাম্ভীর্যময় দৌত্য এতে উপস্থিত হয়েছিল। সম্রাটের অত্যন্ত অনুকূলে ঐ সন্ধি

সম্পাদিত হয়েছিল ; আমি আর তা দিয়ে পাঠককে বিরক্ত করতে চাই নে। ছ'জন রাজদূত এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পাঁচশ' অনুচর। কি চমৎকার তাঁদের আগমন দৃশ্য। তা তাঁদের সম্রাটের ঐশ্বর্যের সম্পূর্ণ দ্যোতক এবং তাঁদের কাজের গুরুত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। রাজদরবারে আমার যেটুকু প্রতিপত্তি ছিল তা দিয়ে সন্ধি সম্পাদনে আমি তাঁহাদের সাহায্য করেছিলাম। রাজদূতরা জানতে পেরেছিলেন আমি তাঁদের কত বড় বন্ধু এবং সে জন্য তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমার অনেক স্তুতিবাচন করেছিলেন, আমার শক্তি, সাহস ও বদান্যতার জন্য, তাঁদের সম্রাটের নামে আমাকে তাঁদের দেশে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁরা আমাকে আমার অসীম শক্তির কিছু প্রমাণ দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যে শক্তি সম্বন্ধে তাঁরা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনেছেন। অনুরুদ্ধ হয়ে আমাকে দুএকটা প্রমাণ তাঁদের দিতে হয়েছিল। তার বিশদ বিবরণ দিয়ে আর পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না।

আমি রাজদূতদের আমার শক্তির পরিচয় দিয়ে অভ্যর্থিত করেছিলাম। তাঁরাও খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এবং খুসিও হয়েছিলেন। আমি রাজদূতদের বলেছিলাম যে আমি অত্যন্ত নিজেকে সম্মানিত মনে করবো যদি তাঁরা আমার গভীর শ্রদ্ধার কথা আমার হয়ে তাঁদের সম্রাটের কাছে নিবেদন করেন। তাঁদের সম্রাটের গুণ গরিমার কথা যথার্থ ভাবেই সারাবিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। আমি তাঁদের জানিয়েছিলাম আমি দেশে ফিরবার পূর্বে সম্রাটের

সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিশ্চয়ই একবার দর্শন করে যাব। সেই মত আমি পরবর্তী সময়ে আমাদের সম্রাটের কাছে আমার যাবার সময়টুকু এসে উপস্থিত হলে আমি তাঁর অনুমতিপত্র প্রার্থনা করেছিলাম যাতে আমি ব্লিফাস্‌কী সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে পারি। তিনি আমাকে সে অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম খানিকটা তাচ্ছিল্য সহকারে। এর কারণ আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। পরে একজন আমাকে চুপে চুপে বলেছিল যে ফ্লিমল্যাপ আর বলগোলাম সম্রাটের কাছে লাগিয়েছিল যে আমি রাজদূতদের সঙ্গে মেলামেশার সময় সম্রাটের উপর আমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধার ভাব দেখিয়েছি, কিন্তু আমি জানি আমার অন্তরে সে ভাব কোন দিনই আসে নি। এই প্রথম আমার মনে রাজদরবার সম্বন্ধে এবং মন্ত্রীদের একটা অস্পষ্ট কি রকম ধারণার উদ্রেক হলো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এখন আমি অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এই দেশ সম্বন্ধে কিছু সাধারণ তথ্য পরিবেশন করবো। এই দেশের মানুষগুলি যেমন ছয় ইঞ্চিরও কম লম্বা, এর পশু-প্রাণী, গাছ-গাছালিও সেই অনুপাতে ছোট ছোট। যেমন ধরা যাক, সব থেকে লম্বা ঘোড়া বা ষাঁড় কত বড়? তারা চার পাঁচ ইঞ্চির বেশী উঁচু নয়। ভেড়াগুলো দেড় ইঞ্চির মত উঁচু, মুরগীগুলো চড়াই পাখীর মত আকারে ছোট হবে। এই রকম প্রত্যেকটা জিনিস ছোট থেকে আরও ছোটতে নেমে গিয়েছে। সব থেকে ছোট প্রাণীগুলো আমার চোখের নজরেই ধরা পড়ত না। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত ভাবে লিলিপুটদের চোখের দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষুদ্র জিনিসও দেখবার উপযোগী ছিল। তারা নিকট থেকে খুব নিখুঁতভাবে দেখতে পেত কিন্তু বেশী দূরে তাদের দৃষ্টি চলতো না। তাদের চোখের দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ তা দেখাবার জন্য একজন পাচক একটা চড়াই পাখিকে টেনে নিয়ে এসেছিল অথচ সেটা একটা সাধারণ মাছির মতও বড় নয়। তা দেখে আমি বড় আমোদ বোধ করেছিলাম। একজন যুবতী একটা ছুঁচে রেশমের সুতো পরাচ্ছিল। আমার চোখে সে ছুঁচ সুতো সবই অদৃশ্য রয়ে গিয়েছিল। তাদের সব চেয়ে লম্বা গাছটাও সাতফুটের বেশী লম্বা নয়; আমারবলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহৎ রাজকীয় উদ্যানের কয়েকটা বড় বড় গাছ সম্বন্ধে। ঐ সমস্ত গাছেরও মাথা আমি হাত মুঠো করেই স্পর্শ করতে পারতাম। অন্যান্য উদ্ভিদ্

সম্বন্ধে ঐ একই কথা। তুলনামূলকভাবে সবই ছোট ছিল। আর বিশদ বিবরণ এ সম্বন্ধে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, পাঠকের কল্পনার উপর আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি এখন বেশী কিছু বলবো না, শিক্ষার সমস্ত দিকেই বহুকাল থেকে তা উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের লেখার পদ্ধতি ছিল বড়ই অদ্ভুত। তারা ইউরোপের লোকের মত বাঁদিক থেকে, ডান দিকে লিখে যেত না অথবা আরবদের মত ডান দিক থেকে বাঁদিকে লিখে যেত না অথবা চীনেদের মত উপর থেকে নীচে লিখতো না, কাশকাজিয়ানদের মত নীচ থেকে লিখতে আরম্ভ করে উপরেও তাদের লেখা উঠতো না ; তাদের লেখার পদ্ধতি ছিল কাগজের এক কোণ ধরে লিখতে আরম্ভ করে কাগজের আর এক কোণে গিয়ে পৌঁছান, যেমন ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত মহিলারা লেখেন।

তারা তাদের মৃত ব্যক্তিদের মাথা নীচু করে গর্তে রেখে কবরস্থ করে, কারণ তারা এই মত পোষণ করে যে, এগার হাজার চাঁদের সময় মৃতরা আবার জাগবে। তারা জানে পৃথিবীটা সমতল আর সেই সময়ে পৃথিবী একেবারে উল্টে যাবে ; তখন তারা ঠিক পায়ের উপরেই দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তিরা অবশ্য এ মতের অবাস্তবতা স্বীকার করেন কিন্তু নিয়ম নিয়মই আছে, কারণ সাধারণ লোক সংস্কার-বিরোধী এবং তাদের মতেই সব কিছু চলে থাকে।

এই সাম্রাজ্যে কতকগুলি অদ্ভুত ধরনের আইন এবং প্রথা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত আইন এবং প্রথাগুলি আমার প্রিয় মাতৃভূমির আইন ও প্রথার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্যশূন্য, তবু এই সব আইন ও

প্রথাগুলির বিষয় আমি একটু বলছি, তাদের পোষকতায় আমি দু'চারটি কথা বলতে আগ্রহান্বিত হচ্ছি। আমি চেয়েছিলাম, আমার প্রিয় মাতৃভূমির মত এদেশেও ঐ সমস্ত আইন ও প্রথাগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার হোক। প্রথমতঃ গুপ্তচরদের কথাই ধরা যাক। এখানে রাষ্ট্র-দ্রোহিতার জন্য কঠিন শাস্তির বিধান আছে কিন্তু বিচারের সময় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নির্দোষিতা পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করতে পারে তা হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নকারীর প্রতি অত্যন্ত হীন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে এবং তার সমস্ত জিনিস পত্র, সম্পত্তি নির্দোষ ব্যক্তি খেসারত স্বরূপ পেয়ে চতুগুণ লাভবান হয়, তার সময় নষ্ট করার খেসারত, যে বিপদের মধ্যে তাকে কাল কাটাতে হয়েছে তার খেসারত, জেলে পড়ে থেকে কষ্ট পাওয়ার খেসারত এবং মামলা পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ভারের খেসারত সে পায়। অথবা যদি দেখা যায় অভিযোগ-কারীর অর্থসম্পত্তি থেকে খেসারত বাবদ পাওয়া সম্পূর্ণ আদায় হচ্ছে না তা হলে রাজার ধনভাণ্ডার থেকে তা যথেষ্টভাবে পূরণ করা হয়। সম্রাট অধিকন্তু নির্দোষ ব্যক্তিকে তাঁর প্রিয় কোন নিদর্শন দান করেন এবং রাজ্যময় ঘোষণা করা হয়ে থাকে লোকটির নির্দোষিতার কথা।

লিলিপুটবাসীরা চুরি অপেক্ষা তঞ্চকতাকে আরও বেশী দোষের ব'লে মনে করে, সেই তঞ্চককে তারা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে। কারণ তারা বলে সাধারণ জ্ঞান মত যত্ন এবং লক্ষ্য রাখলে চুরির থেকে জিনিসপত্র রক্ষা করা যায়, কিন্তু অত্যন্ত চালাক শঠদের কাছ থেকে সৎ-ব্যক্তিদের রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই। কেনা-বেচার বাজারে সর্বক্ষণই আদান-প্রদান চলে বা ধার দেওয়া নেওয়া হয়ে থাকে এবং এই সব স্থানেই একজন অপরকে ঠকিয়ে নিতে পারে

অথবা সেই কাজে উৎসাহ দিতে পারে। ব্যবসা-পত্র সবই নষ্ট হয়, যদি না এই সব ঠগ জুয়াচোরদের শাস্তি দেবার আইন থাকে। সৎ ব্যবসায়ী না হলে নষ্ট হয়ে যাবে, আর ধাপ্পাবাজরা তার সুবিধা ভোগ করবে। আমি একবার এক দোষীর পক্ষ নিয়ে রাজার নিকট দরবার করেছিলাম। দোষী ব্যক্তিটি তার মনিবের বহু অর্থ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি বলতে চেয়েছিলাম লোকটি বিশ্বাস ভঙ্গ করার দোষে দোষী। মহারাজ তো আমাকে পাষণ্ডই ভেবে নিয়েছিলেন যেহেতু আমি কেমন করে সব থেকে দোষের কাজের পক্ষে কথা বলতে পেরেছিলাম। প্রকৃতই আমি মহারাজকে কিছুই জবাব করতে পারি নি এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে এই বলে সাফাই গাইতে হয়েছিল যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রীতি, আচার, আচরণ পৃথক। আমাকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

যদিও আমরা মুখে বলি যে শাস্তি বিধান করা ও পুরস্কৃত করা এই দুই কব্জার উপরেই দেশের সরকার ঘোরে। কিন্তু লিলিপুটদের দেশে এই নীতিটি যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে চলা হয় এমনটি আমি কোথাও দেখি নি। সেখানে যদি কেউ দেখাতে পারে যে সে তিয়াত্তর চাঁদ পর্যন্ত তার দেশের আইন-শৃঙ্খলা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলছে তাহলে সে তার গুণাবলী ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য মত অনেকখানি সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হবে। একটা অর্থ ভাণ্ডার থেকে, যে অর্থভাণ্ডার এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত, কিছু অর্থও পাবে। স্নিনপল অর্থাৎ ন্যায়ানুগ এই উপাধি তাকে দেওয়া হবে। এই উপাধি তাহার নামের সঙ্গে যুক্ত হবে,

তার সন্তান-সন্ততিরা এই উপাধি ব্যবহার করতে পারবে না। আমি যখন তাদের বলেছিলাম যে আমাদের দেশে শাস্তির মাধ্যমেই আইন মেনে চলা হয়, পুরস্কারের কোন ব্যবস্থা নেই, তখন তারা আমাদের পদ্ধতির বিরাট ত্রুটির কথাই বলেছিল। এই জন্যই সে দেশে তাদের বিচারশালায় ন্যায়ের মূর্তি গড়ে রাখা হয়েছে। সে মূর্তি ছয় চক্ষুবিশিষ্ট, দুটি চক্ষু সম্মুখ দিকে, দুটি চক্ষু মূর্তির পিছন দিকে, আর দুটি মূর্তির দক্ষিণে ও বামে একটি করে, যেন তাঁর দৃষ্টি সব দিকে প্রসারিত। তাঁর দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণপূর্ণ খোলা একটি থলে। বাম হস্তে কোষবদ্ধ তরবারি, মূর্তি যেন মানুষকে পুরস্কৃত করতেই চান, শাস্তি দিতে নয়।

লোককে কাজে নিযুক্ত করবার সময় তারা বিরাট কর্মশক্তির উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া অপেক্ষা নৈতিক চরিত্র ভাল এমন লোকের উপরেই বেশী ঝোঁক দেন। সরকার প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন। মানুষের সাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তাকে, একটা না একটা কাজের উপযুক্ততা দিয়েছে। ঈশ্বরের এটা কখনও অভিপ্রেত নয় যে, সর্বসাধারণের কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, খুব উচ্চস্তরের জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষণজন্মাদেরই প্রয়োজন। সে রকম ক্ষণজন্মা লোকতো যুগে তিনটের বেশী মেলে না। তাদের ধারণা সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধীমত্তা প্রভৃতি গুণরাজি প্রত্যেক মানুষই আয়ত্তাধীনে আনতে পারে আর এই সমস্ত গুণরাজিই, অনুশীলনের দ্বারা এবং সৎবুদ্ধি প্রণোদিত হলে, প্রত্যেক মানুষকেই, দেশ সেবার উপযুক্ত করে তুলতে পারে। যেখানে শুধু বিশেষ পড়াশুনার দরকার সেই সব

ক্ষেত্র ছাড়া। কিন্তু তারা ভাবে নৈতিক চরিত্রের অভাব কখনও মানুষের চিন্তার উৎকর্ষতার দ্বারা পূরণ হতে পারে না, কাজেই, সরকারের কাজ ঐ সমস্ত গুণসম্পন্ন বিপজ্জনক হাতে ন্যস্ত রাখা যেতে পারে না এবং এটা ঠিকই যে অনবধানতা প্রযুক্ত ভুল কোন সৎলোকের দ্বারা ঘটলেও তা সর্বসাধারণের পক্ষে খুব দুর্বিপাক ডেকে আনে না, কিন্তু যে সমস্ত লোক চারিত্রিক ভাবে বদ অথচ তাদের কাজের বিলিব্যবস্থা করবার ক্ষমতা অসাধারণ তারা ভূরি ভূরি অসৎ কাজ করবে এবং তার সমর্থকও তারা পাবে।

ঠিক ঐরূপ ভাবে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের উপর কোন লোক যদি বিশ্বাস না রাখে, তা হলে, তাকে কোন সরকারী পদে বহাল করা হবে না। কারণ রাজারা শপথ নিয়ে বলেন যে তাঁরা ঈশ্বর স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তা মাত্র। লিলিপুটরা এর থেকে অবাস্তব জিনিস ভাবতেই পারে না যে, কোন রাজকুমার এমন লোককে কাজে নিয়োগ করতে পারেন যে লোক তিনি যার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আছেন তাকেই অস্বীকার করে থাকে।

এই সমস্ত নিয়ম নীতির উল্লেখ দ্বারা আমি তাদের মূল শাস্ত্রের কথাই বলতে চেয়েছি, অধঃপতিত মানুষের দ্বারা এদের চারিত্রিক অবনতিও ঘটেছে সে বিষয়ে আমি কিছু বলি নি। সে সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়, কি ভাবে কুখ্যাত দড়ি নৃত্যের প্রদর্শন দ্বারা রাজ্যের বড় বড় পদগুলি কুক্ষিগত করা হয়েছিল, অথবা লাঠি ডিঙিয়ে বা তার তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে রাজ অনুগ্রহের তকমা যোগাড় করা হয়েছিল। পাঠককে স্মরণ

রাখতে বলি যে, এই সব বিষয় বর্তমান সম্রাটের ঠাকুরদাদা প্রথম চালু করেছিলেন। বর্তমানে এই সব বিষয় খুব উচ্চ স্থান দখল করেছে কারণ যেমন দলবৃদ্ধি ঘটেছে তেমনি মতবিরোধও বেড়ে গিয়েছে।

আমরা পড়েছি কোন কোন দেশে অকৃতজ্ঞতা মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ, এদেশেও সেটা তদ্রূপ অপরাধের। এর কারণ তারা এই রকম দেখায় যে, যে ব্যক্তি তার উপকারী জনেরই ক্ষতি করতে পারে সে নিশ্চয়ই সর্বসাধারণকে শত্রুরূপেই দেখবে কারণ সে সাধারণের কাছ থেকে তো কোন উপকারই পায় নি এবং সেই হেতু এ রকম লোক বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয়।

পিতা-মাতা এবং সন্তানের কর্তব্য সম্বন্ধে এদেশের লোকের ধারণা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লিলিপুটের লোকেদের কথা হচ্ছে পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি মমত্ববোধসম্পন্ন হন সে তো প্রকৃতিগত কারণেই এবং সেই কারণেই তারা কদাচ তাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের ভাবতে দেবে না যে তাদের পিতা-মাতার প্রতি তাদের পৃথিবীতে আনার জন্য কোন কর্তব্য থাকা উচিত। মনুষ্য জীবনের দুর্দশার কথা ভেবে বলা যায় যে এই আগমনের কোন অর্থই হয়না। তাদের পিতামাতারাও এর মধ্যে কোন অর্থ আরোপ করেন নি। তাদের মত হচ্ছে বাবা-মা ছাড়া যে কোন লোকের উপর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার দেওয়া যায় এবং সেইজন্য প্রত্যেক শহরে তাদের শিশুনিকেতন রয়েছে যেখানে কুটীরবাসী এবং দিনমজুর ছাড়া প্রত্যেক পিতা-মাতাকে তাদের শিশুদের বিশ চাঁদ বয়স প্রাপ্ত হলেই প্রতিপালিত হবার জন্য এবং শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাতে হয়। এই

সব বিদ্যালয় নানান ধরনের, শহরের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার উপযোগী করে তৈরী এবং মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই উপযোগী। এই সব শিশুনিকেতনে উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন অধ্যাপকগণ আছেন, যাঁরা, শিশুদের পিতামাতার পদমর্যাদার উপযোগী করে, শিশুদের ক্ষমতা ও আগ্রহ বুঝে মানুষ করছেন। আমি প্রথমে ছেলেদের শিশুনিকেতন সম্বন্ধে কিছু বলবো তারপর বলবো মেয়েদের জন্য শিশুনিকেতন সম্বন্ধে।

সম্ভ্রান্ত বংশে যে সব শিশু জন্মেছে তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে গম্ভীর প্রকৃতির বিদ্বান অধ্যাপকদের। তাঁদের সঙ্গে একদল সাহায্যকারী অধ্যাপকও আছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহারের ব্যবস্থা খুব সাধারণ রকম। সম্মান, ন্যায়বিচার, সাহস, গাম্ভীর্য, ক্ষমা, ধর্ম.এবং দেশের প্রতি ভালবাসা এই সব শিক্ষা সামনে ধরে তাদের মানুষ করে তোলা হয়। খুব কম সময়ের জন্য খাওয়া ও ঘুমান বাদে তাদের সব সময় কাজের মধ্যে নিযুক্ত রাখা হয়। দুঘণ্টার জন্য তারা অন্য বিষয়ে মন দিতে পারে, যেমন ব্যায়াম ইত্যাদি। চার বৎসর বয়েস না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ মানুষের দ্বারা তাদের পোশাক পরান হয়, তারপর তারা নিজেরাই পোশাক পরে যদিও তাদের পদমর্যাদা খুবই উচ্চস্তরের। আমাদের দেশের পঞ্চাশ বছর বয়সের স্ত্রীলোকরা যে রকম অবস্থাপ্রাপ্ত হন তদনুরূপ শারীরিক অবস্থাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকরা সেখানে খুব নিম্নপদে বহাল থাকেন। চাকর-বাকরের সঙ্গে ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। তারা ছোট ছোট দলে অথবা বড় দলে ভাগ হয়ে অধ্যাপক বা সহ-অধ্যাপকের সঙ্গে চিত্ত-বিনোদনে বার হয়। এইভাবে তারা তাদের শিশুমনকে পাপ ও

অন্যায় থেকে রক্ষা করে। আমাদের দেশের শিশুরা শিশু অবস্থাতেই পরিপক্ক হয়ে ওঠে। তাদের পিতামাতারা বৎসরে দুবার মাত্র তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে পান এবং দেখা করবার সময়ও এক ঘণ্টার বেশী দেওয়া হয় না। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের দেখা হলে বা বিদায়ের সময় চুম্বন দিয়ে থাকেন কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একজন অধ্যাপক সর্বদাই উপস্থিত থাকেন। তিনি মা-বাবাকে চুপি চুপি কথা বলতেও দেন না বা কোন রকম খেলনা বা মিঠাই দিতেও দেন না। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও খাওয়া থাকার খরচ প্রত্যেকের পরিবার থেকে যোগান হয়, সময়ে দিতে না পারলে সম্রাটের কর্মচারীরা তা আদায় করে দেন।

সাধারণ ভদ্রলোক, ব্যবসাদার, বণিক, ছোটখাট ব্যবসায়ী অথবা শিল্পজীবীদের সন্তানরাও ঐ একই ভাবে কিছু ইতর বিশেষ করে শিশুনিকেতনে মানুষ হয়। কেবল যারা শিল্পকর্ম করবে তাদের এগার বছর বয়সেই শিক্ষানবিশীতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। আবার বিশেষ গুণসম্পন্ন লোকদের সন্তানদের পনর বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা নিতে দেওয়া হয়, আমাদের সঙ্গে তুলনায় একুশ বছর পর্যন্ত ধরা যেতে পারে।

মেয়েদের জন্য যে সব শিশুনিকেতন আছে সেখানেও ঐ একই ব্যবস্থা। কেবল তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে দেয় মেয়ে খিদমদগারনীরা। অধ্যাপক বা সহ-অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে এসব তারা করে থাকে। পাঁচ বছরে পড়লে পর তারা নিজেরাই নিজে নিজে পোশাক পরে। যদি কখনও ধারণা হয় যে এই সব খিদমদগারনীরা মেয়েদের কাছে ভয় দেখান গল্প বা অদ্ভুত কোন গল্প

করছে তা হ'লে শহরের জায়গায় জায়গায় তাদের দাঁড় করিয়ে তিনবার বেত মারা হয়, এক বছরের জন্য কয়েদ রাখা হয় এবং তারপর তাদের শহরের নির্জন কোন স্থানে চিরজীবনের মত আটক করে রাখা হয়। সেই জন্য এই দেশের যুবক-যুবতীরা বোকা বা ভীরু আখ্যা পেতে অত্যন্ত লজ্জা পায়। ইহারা অলঙ্কার পছন্দ করে না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সভ্য ভব্যতাই ভালবাসে। আমি ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে শিক্ষার কোন পার্থক্য লক্ষ্য করি নি। কেবল দেখেছি মেয়েদের ব্যায়াম ছেলেদের ব্যায়ামের মত অত ভারী ধরনের নয়। গার্হস্থ্য জীবনের কিছু নিয়ম-কানুন তাদের শেখান হয়। তাদের শিক্ষণীয় বিষয়ও কিছু পাতলা রাখা হয়। তাদের ধারণা এবং বিশ্বাস যে উচ্চাদর্শ মানুষের পক্ষে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, সহিষ্ণু স্ত্রীই কাম্য। বালিকারা বার বছরে পড়লে, ঐটাই বিবাহ-যোগ্য বয়স, তাদের বাবা, মা বা অভিভাবকগণ তাঁদের বাড়ী নিয়ে আসেন। সে সময় তাঁরা অধ্যাপকদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মেয়েদের ও তাদের সঙ্গীদের, চোখে তখন প্রায়ই জল বার হতে দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের শিশুনিকেতন মেয়েদের উপযোগী সব রকম কাজই শেখান হয়। যারা শিক্ষানবিশ হতে চায় তাদের নয় বছর বয়সেই ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকীদের তের বছর বয়স পর্যন্ত রাখা হয়।

আরও নিম্নশ্রেণীর পরিবারদের ছেলে মেয়েদের জন্য পিতা-মাতাদের স্বল্প বাৎসরিক ভাতা বাদেও তাদের আয়ের কিছু অংশ তাদের ছেলেমেয়েদের খরচ সঙ্কুলানের জন্য শিশুনিকেতনের

অন্যায় থেকে রক্ষা করে। আমাদের দেশের শিশুরা শিশু অবস্থাতেই পরিপক্ক হয়ে ওঠে। তাদের পিতামাতারা বৎসরে দুবার মাত্র তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে পান এবং দেখা করবার সময়ও এক ঘণ্টার বেশী দেওয়া হয় না। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের দেখা হলে বা বিদায়ের সময় চুম্বন দিয়ে থাকেন কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একজন অধ্যাপক সর্বদাই উপস্থিত থাকেন। তিনি মা-বাবাকে চুপি চুপি কথা বলতেও দেন না বা কোন রকম খেলনা বা মিঠাই দিতেও দেন না। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও খাওয়া থাকার খরচ প্রত্যেকের পরিবার থেকে যোগান হয়, সময়ে দিতে না পারলে সম্রাটের কর্মচারীরা তা আদায় করে দেন।

সাধারণ ভদ্রলোক, ব্যবসাদার, বণিক, ছোটখাট ব্যবসায়ী অথবা শিল্পজীবীদের সন্তানরাও ঐ একই ভাবে কিছু ইতর বিশেষ করে শিশুনিকেতনে মানুষ হয়। কেবল যারা শিল্পকর্ম করবে তাদের এগার বছর বয়সেই শিক্ষানবিশীতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। আবার বিশেষ গুণসম্পন্ন লোকদের সন্তানদের পনর বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা নিতে দেওয়া হয়, আমাদের সঙ্গে তুলনায় একুশ বছর পর্যন্ত ধরা যেতে পারে।

মেয়েদের জন্য যে সব শিশুনিকেতন আছে সেখানেও ঐ একই ব্যবস্থা। কেবল তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে দেয় মেয়ে খিদমদগারনীরা। অধ্যাপক বা সহ-অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে এসব তারা করে থাকে। পাঁচ বছরে পড়লে পর তারা নিজেরাই নিজে নিজে পোশাক পরে। যদি কখনও ধারণা হয় যে এই সব খিদমদগারনীরা মেয়েদের কাছে ভয় দেখান গল্প বা অদ্ভুত কোন গল্প

করছে তা হ'লে শহরের জায়গায় জায়গায় তাদের দাঁড় করিয়ে তিনবার বেত মারা হয়, এক বছরের জন্য কয়েদ রাখা হয় এবং তারপর তাদের শহরের নির্জন কোন স্থানে চিরজীবনের মত আটক করে রাখা হয়। সেই জন্য এই দেশের যুবক-যুবতীরা বোকা বা ভীরু আখ্যা পেতে অত্যন্ত লজ্জা পায়। ইহারা অলঙ্কার পছন্দ করে না. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সভ্য ভব্যতাই ভালবাসে। আমি ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে শিক্ষার কোন পার্থক্য লক্ষ্য করি নি। কেবল দেখেছি মেয়েদের ব্যায়াম ছেলেদের ব্যায়ামের মত অত ভারী ধরনের নয়। গার্হস্থ্য জীবনের কিছু নিয়ম-কানুন তাদের শেখান হয়। তাদের শিক্ষণীয় বিষয়ও কিছু পাতলা রাখা হয়। তাদের ধারণা এবং বিশ্বাস যে উচ্চাদর্শ মানুষের পক্ষে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, সহিষ্ণু স্ত্রীই কাম্য। বালিকারা বার বছরে পড়লে, ঐটাই বিবাহ-যোগ্য বয়স, তাদের বাবা, মা বা অভিভাবকগণ তাঁদের বাড়ী নিয়ে আসেন। সে সময় তাঁরা অধ্যাপকদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মেয়েদের ও তাদের সঙ্গীদের, চোখে তখন প্রায়ই জল বার হতে দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের শিশুনিকেতন মেয়েদের উপযোগী সব রকম কাজই শেখান হয়। যারা শিক্ষানবিশ হতে চায় তাদের নয় বছর বয়সেই ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকীদের তের বছর বয়স পর্যন্ত রাখা হয়।

আরও নিম্নশ্রেণীর পরিবারদের ছেলে মেয়েদের জন্য পিতা-মাতাদের স্বল্প বাৎসরিক ভাতা বাদেও তাদের আয়ের কিছু অংশ তাদের ছেলেমেয়েদের খরচ সঙ্কুলানের জন্য শিশুনিকেতনের

ব্যবস্থাপকের হাতে দিতে হয়, সেই জন্য এই সব শিশুদের পিতামাতাকে আইন মতই খরচ সঙ্কুলান করতে হয়। গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা জামিন দেয় যে তারা তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য পৃথক পৃথক নামে আলাদা করে টাকা জমা রাখবে। এই সমস্ত টাকার অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ন্যায় ধর্মমত ব্যবস্থাপনা করা হয়।

কুটীরবাসী এবং দিন-মজুররা তাদের ছেলে-মেয়েদের বাড়ীতে রেখেই লালন-পালন করে। তাদের কাজ জমি চাষ করা। কাজেই সাধারণের তরফ থেকে তাদের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার পক্ষে কোন মূল্য নেই। তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ হয়েছে বা রোগগ্রস্ত হয়েছে তাদের আরোগ্য-নিকেতনে স্থান দেওয়া হয়, কারণ এই রাজ্যে ভিক্ষা বৃত্তি কি তা কেউ জানে না।

এখন, আমি এই দেশে ন'মাস তের দিন বাস করবার সময় আমার গৃহস্থালী জীবনযাপন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের কিছু খতিয়ান দিয়ে,অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনকে অন্য দিকে একটু টানব। প্রয়োজনের তাগিদে আমি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে কিছুটা মিস্ত্রীর কাজে খাটিয়েছিলাম। আমি রাজকীয় উদ্যানের সব থেকে বড় গাছ দিয়ে আমার নিজের জন্য একটি টেবিল ও একখানি চেয়ার তৈরী করে নিয়েছিলাম। আমার জামা তৈরী করবার জন্য দুশো দর্জির দরকার হয়েছিল। আমার বিচানার ও টেবিলের ঢাকা তৈরী করবার জন্য তাদের সব থেকে মোটা কাপড় ব্যবহার করতে হয়েছিল। তাও এক ফেরতা দিয়ে করা সম্ভব হয় নি ; কয়েকটা ভাঁজ দিয়ে মোটা করে তাদের সেলাই করা হয়েছিল। তাতেও যা দাঁড়িয়েছিল তাও

খুব পাতলা কাপড়ের থেকেও পাতলা পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কাপড়ের থান সাধারণতঃ তিন ইঞ্চি চওড়া ও তিন ফুট লম্বা। দর্জিরা আমার গায়ের মাপ নিয়েছিল। আমি শুয়ে পড়েছিলাম, একজন আমার গলার কাছে দাঁড়িয়েছিল, একজন দাঁড়িয়েছিল আমার পায়ের মাঝ বরাবর। তারা দুজন একটা ফিতের দুমুড়ো টেনে ধরেছিল, আর তৃতীয় একজন এক ইঞ্চি লম্বা একটা মাপ দিয়ে ফিতেটা মেপে গিয়েছিল। তারপর তারা আমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের বেড়টা মেপে নিয়েছিল। বাস ঐ পর্যন্ত। তারা আর কোন মাপ নেয় নি। তারপর তারা অঙ্ক কষে আমার কব্জির মাপ, গলার মাপ, কোমরের মাপ সব বার করেছিল। বুড়ো আঙ্গুলের দু'ঘের বেড়ের সমান হাতের কব্জির ঘের ঐ ভাবে তারা গলা কোমর সবের মাপ বার করেছিল এবং আমি আমার পুরান জামাটা বিছিয়ে ধরেছিলাম— তার মাপ নিয়ে তারা আমার জামা বানিয়ে দিয়েছিল। সে জামা আমার গায়ে চমৎকার মাপ মত মানিয়েছিল।

আমার পোশাক তৈরী করবার জন্য তিনশো দর্জি নিযুক্ত হয়েছিল। আমার মাপ নেবার জন্য তারা এবার অন্য একটা মতলব ঠিক করেছিল। আমি হাঁটু মুড়ে বসেছিলাম, তারা একটা মই এনে মাটি থেকে আমার কাঁধ বরাবর লাগিয়েছিল। একজন মইয়ে চড়ে আমার জামার গলাবন্ধ থেকে মাটি পর্যন্ত মাপের ফিতে ঝুলিয়ে আমার কোটের ঝুলের মাপ বা'র করেছিল। আমি নিজেই আমার হাতের মাপ ও কব্জির মাপ নিয়ে দিয়েছিলাম। যখন আমার পোশাক তৈরী শেষ হ'লো, আমার বাসায় বসেই তা তৈরী হয়েছিল কারণ দর্জিদের ঘরে তা ধরবে কেন, তখন সে পোশাক দেখে মনে

হলো ইংলণ্ডের মেয়েরা যেন তালি লাগিয়েছে—পার্থক্য শুধু এটা একরঙা।

আমার খাবার তৈরী করবার জন্য তিনশো রাঁধুনী ছিল। তারা আমার ঘরের চারধারে ছোট ছোট বাড়ীতে তাদের পরিবারদের নিয়ে বাস করতো। তারা পৃথক পৃথক ভাবে ছু'থালা করে খাবার তৈরী করে এনে দিত। আমি কুড়িজন পরিবেশককে হাতে করে তুলে ধরে টেবিলে নামিয়ে দিতাম; আরও একশো জন নিচের মাটিতে অপেক্ষা করতো, কেউ মাংসের থালা নিয়ে, কেউ কেউ মদের পিপে বা অন্য কোন রকম পানীয় তাদের কাঁধে ঝুলিয়ে। টেবিলের উপর দণ্ডায়মান পরিবেশনকারীরা আমি-যেমন যেমন চাইতাম ঠিক সেই সেই জিনিস তারা দড়ি দিয়ে টেনে টেবিলের উপর তুলে দিত, কায়দাটা ঠিক আমাদের দেশের কুয়া থেকে কলসী করে জল তোলার মত। তাদের দেওয়া এক থালা মাংস আমার ঠিক পুরা একটি গ্রাস হতো এবং তাদের এক পিপে মদে আমার মোটামুটি একটা চুমুক চলতো। তাদের ভেড়ার মাংস আমাদের দেশের ভেড়ার মাংসের থেকে নিকৃষ্ট কিন্তু গোমাংস ছিল উপাদেয়। আমি একবার একটা ভাল শিরদাঁড়ার টুকরো খেয়েছিলাম, সেটা এত বড় যে আমার সেটাকে তিন কামড়ে খেতে হয়েছিল, কিন্তু এ রকমটি কদাচিং মিলেছে। একটা চড়াই পাখীর ঠ্যাং আমরা দেশে যেমন করে চিবিয়ে খেয়ে থাকি ঠিক সেই ভাবে একটা গরুর গোটা শিরদাঁড়াটা হাড় শুদ্ধ চিবিয়ে খেতে দেখে আমার চাকরগুলো বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। একটা গোটা হাঁস বা একটা গোটা মুরগী আমার এক গ্রাসেই শেষ হয়েছে

এবং আমি এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবো তারা আমাদের দেশের হাঁস মুরগী অপেক্ষা খেতে অনেক বেশী সুস্বাদু। তাদের ছোট জাতের মুরগীগুলোকে বিশ ত্রিশটা করে ছুরির ডগায় তুলে নিতে পারতাম।

আমার খাওয়া-থাকার সংবাদ শুনে একদিন মহামান্য সম্রাট বাহাদুর তাঁর মহিষীকে নিয়ে এবং রাজপরিবারের রক্তের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার সঙ্গে বসে আহার করে আনন্দ লাভ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আনন্দিত হবেন এ কথা তিনিই ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা সকলে সেই মত এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁদের সকলকে তুলে আমার টেবিলের উপর রাজপরিবারের বসবার জন্য চেয়ারে ঠিক আমার সামনা সামনি মুখ করে বসিয়ে দিলাম। তাঁদের দেহরক্ষীরাও তাদের চারপাশে ছিল। রাজকোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপও তাহার শ্বেত দণ্ডটি হস্তে ধারণ করে সকলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। আমি দেখেছিলাম তিনি বিষণ্নবদনে ঘন ঘন আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। আমি দেখেও তা দেখি নি অধিকন্তু আমি খেয়েই যাচ্ছিলাম এবং বেশী করেই খাচ্ছিলাম আমার প্রিয় দেশের যাতে সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং রাজ-দরবারেও যাতে আমার প্রশংসা হয়। মহারাজের আমার সঙ্গে বসে ভোজন করতে আসায় ফ্লিমন্যাপের আমার বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে লাগাবার সুবিধা হবে এ কথা বিশ্বাস করবার আমার নিজস্ব কারণ ছিল। এই মন্ত্রীটি গোপনে বরাবরই আমার শত্রুতা করে এসেছে। তার স্বাভাবিক বিষণ্ণ চরিত্রের পক্ষে অস্বাভাবিক হ'লেও সে আমাকে বাহ্যিক ভাবে যত্ন নেওয়ার ভাব দেখাত। সে সম্রাটকে রাজকোষের

শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়েছিল যে তাকে অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার করতে হচ্ছে। এ কথাও বলেছিল রাজকীয় হুণ্ডীও শতকরা উননব্বইয়ের বেশী দামে কাটছে না। সংক্ষেপে বলতে কি আমাকে খাওয়াতে সম্রাটের রাজকোষ থেকে প্রায় দেড় মিলিয়ান স্প্রাগস (সব থেকে বড় স্বর্ণমুদ্রা) খরচ হয়ে গিয়েছিল। এখন আমাকে বাগ বুঝে তাড়িয়ে দেওয়াই ছিল সম্রাটের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কাজ।

সপ্তম অধ্যায়

এই দেশ ত্যাগ করে যাবার ঘটনার বিশদ বিবরণ বর্ণনা করবার পূর্বে পাঠককে একটা খবর জানান যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি যে প্রায় ছু'মাস পূর্বে থেকে আমার বিরুদ্ধে গোপনে এক ষড়যন্ত্র চলছিল।

আমার হীন অবস্থার জন্য আমি সারাজীবনই রাজদরবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলাম। অবশ্য আমি রাজরাজড়াদের খেয়াল-খুশি সম্বন্ধে অনেক শুনেছিলাম এবং পড়েও ছিলাম, কিন্তু তার এমন ভয়ঙ্কর রূপ আমাকে এই দূরদেশে, যে দেশের শাসন ব্যবস্থা ইউরোপের শাসন ব্যবস্থার ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, দেখতে হবে. তা ভাবি নি। আমি যখন ব্লিফাস্কু দেশের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি ঠিক সেই সময় রাজদরবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যার আমি অনেক উপকার করেছিলাম যখন তিনি মহামান্য সম্রাটের অত্যন্ত অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ হয়েছিলেন, রাত করে অত্যন্ত গোপনে একখানা ঢাকা চেয়ারে চড়ে এসে নাম না জানিয়ে আমার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবার অনুমতি চাইলেন। বাহকদের চলে যেতে বলে দিয়ে চেয়ার শুদ্ধ তুলে নিয়ে, আমি সেই সম্ভ্রান্ত মহোদয়কে আমার কোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। আমি আমার বিশ্বস্ত একটি চাকরকে বলেছিলাম যে কেউ খোঁজ করলে বলবে যে আমার শরীরটা খারাপ বোধ হওয়ায় আমি শুয়ে

পড়েছি। এই কথা বলে আমি আমার ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিয়েছিলাম এবং সচরাচর আমি যেমন করতাম সেইভাবে আমি আমার টেবিলের উপর চেয়ারটি পকেট থেকে বা'র করে স্থাপন করে আমি তার কাছে বসেছিলাম। সাধারণ নমস্কার বিনিময়ের পর আমি সম্ভ্রান্ত মহোদয় ব্যক্তির মুখাবয়বে অত্যন্ত উদ্বেগের লক্ষণ পরিস্ফুট দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর বক্তব্য খুব ধৈর্য ধরে শুনতে বলেছিলেন, কারণ আমার মানসম্ভ্রম এবং জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। তাঁর বক্তব্য আমি নিম্নে উদ্ধৃত করছি। তিনি যা বলেছিলেন তিনি চলে যাওয়ারপর আমি তা লিখে নিয়েছিলাম।

তিনি বলেছিলেন "আপনি জানবেন যে আপনার বিষয় নিয়ে অতি গোপনে সামান্য কয়েকদিন পূর্বে কয়েকটা দরবার সভা ডাকা হয়েছিল এবং মাত্র ছুদিন হ'লো মহামান্য সম্রাট আপনার বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আপনি জানেন যে স্কাইরেস বল গোলাম (গলবেট বা উচ্চ নৌ-সেনাপতি) আপনার এ দেশে পৌঁছানর সময় থেকেই আপনার প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। তাঁর এইরূপ শত্রুভাবাপন্ন হওয়ার মূল কারণ যে কি তা আমি জানি না, কিন্তু তাঁর আপনার প্রতি ঈর্ষা—আপনার ব্লিফাস্কুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ তাঁর নৌ-সেনাপতির গৌরব অস্তমিত হওয়ায়—বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্ভ্রান্ত মহোদয় ফ্লিমন্যাপ কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি রিমটক, রাজবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক ল্যানকম এবং আইন উপদেষ্টা বলমাফ প্রভৃতির সঙ্গে সহযোগিতায় আপনার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও অন্যান্য মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের দোষ দেখিয়ে আরজি তৈরী করেছে।"

এই মুখবন্ধ শুনেই, আমি আমার গুণাবলী ও নির্দোষিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকায়, আমি তাঁর বক্তব্যে বাধা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর বক্তব্য পেশে বাধা না দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনি নিম্নোক্তরূপ বলেছিলেন ঃ

"আমার প্রতি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের সমস্ত সংবাদ নিয়েছি এবং আরজির একটা নকলও সংগ্রহ করেছি, যদিও আপনার এই কাজটুকু করতে আমাকে আমার মস্তকটিকেই বিপদাপন্ন করতে হয়েছে।"

কুইন বাস ফ্লেমট্রিনের (পর্বত মানুষ) বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এক নম্বর অভিযোগ

অভিযুক্ত কুইন বাস ফ্লেম্‌ট্রিন যখন ব্লিফাস্‌কু সাম্রাজ্যের রণতরী বহর লিলিপুট সাম্রাজ্যের রাজকীয় নৌ-ঘাঁটিতে ধরে নিয়ে এসেছিল, তখন তাকে মহামান্য সম্রাট হুকুম দিয়েছিলেন, উপরি উক্ত ব্লিফাস্‌কু সাম্রাজ্যের সমস্ত নৌ-বহরকেই ধরে আনবার জন্য এবং আমাদের দেশের অধীন একটি প্রদেশে ব্লিফাস্‌কু সাম্রাজ্যকে পরিণত করবার জন্য, যে প্রদেশকে আমাদের দেশ থেকে প্রেরিত একজন শাসনকর্তা শাসন করতে পারতেন এবং ডিমের বড় দিক ভাঙবার পক্ষীয় সকলকে ধ্বংস করবার হুকুম তাকে দেওয়া হয়েছিল এবং ব্লিফাস্‌কু সাম্রাজ্যের ঐ মতাবলম্বী সকলকেই ধ্বংস করবার হুকুম

দেওয়া হয়েছিল, যদি তারা তাদের সে মত পরিত্যাগ না করে। কিন্তু ফ্লেম্‌ট্রিন মহামান্য সম্রাটের প্রতি প্রবঞ্চনা মূলে এবং বিশ্বাস-ঘাতকের ন্যায়, দরখাস্তের দ্বারা ঐ সমস্ত কাজ করার পক্ষে অক্ষমতা জানিয়ে মাপ চেয়েছিল। সে অজুহাত দেখিয়েছিল যে, সে নির্দোষ ব্যক্তিদের হত্যা করতে বা তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে অপারগ।

দুই নম্বর অভিযোগ

অভিযুক্ত ফ্লেম্‌ট্রিন পরিষ্কার জানত যে ব্লিফাস্‌কুর রাজা সম্রাটের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন। এ কথা জেনেও সে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায়, ব্লিফাস্‌কু দেশ থেকে আমাদের রাজ দরবারে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আগত রাজদূতদের প্রতি, সব রকম সাহায্য, তাদের সুখসুবিধা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেছিল।

তিন নম্বর অভিযোগ

যে ব্লিফাস্‌কুর সম্রাট এই সেদিন প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে আমাদের সম্রাটের সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাকে সাহায্য ও তোষামোদ করবার জন্য এই বিশ্বাসঘাতক ফ্লেম্‌ট্রিন তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঐ দেশে যাবার মৌখিক অনুমতি আমাদের সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করেছে। কোন রাজভক্ত প্রজার দ্বারা এ কাজ সম্ভব ছিল না।

"আরও অভিযোগ আছে কিন্তু এই কটাই মুখ্য, আমি মোটা-মুটি তা আপনাকে পড়ে শুনালাম।"

"এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে মহামান্য সম্রাট বাহাদুর আপনাকে অভিযুক্ত করে যতগুলি বক্তৃতা হয়েছে—সে সব বক্তৃতার সময় অত্যন্ত ক্ষমাশীল হতে চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় খুব জোর দিয়ে আপনি তাঁর যে উপকার করেছেন সে সব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং আপনার অপরাধগুলিকে পাতলা করবার চেষ্টা করেছেন। নৌ-সেনাপতি আপনার ঘরে অগ্নিসংযোগ করে আপনাকে খুব যন্ত্রণাদায়ক হীনমৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য অত্যন্ত জিদ করেছিলেন। সেনাপতি বিশ হাজার সৈন্যকে বিষাক্ত তীর নিয়ে তৈরী থাকতে বলেছিলেন আপনার হাতে মুখে তীরবিদ্ধ করবার জন্য। আপনার কয়েকজন চাকরকে গোপনে হুকুম দেবার কথা ঠিক হয়েছিল। তারা আপনার জামা-কাপড়ে বিষাক্ত এক রকম রস মাখিয়ে রাখবে, তার জ্বালায় আপনি নিজের গায়ের চামড়া নিজে ছিঁড়বেন এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে আপনার মৃত্যু ঘটবে। মহামান্য সম্রাট কিন্তু আপনার প্রাণটা যাতে রক্ষা হয় সেই ইচ্ছা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজবাড়ীর বিলি-ব্যবস্থাপককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মহামান্য সম্রাট গোপন বিষয়ের প্রধান সচিবকে এই বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে আপনার যথার্থ বন্ধু বলেই ভাবতেন। তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন। আপনার তাঁর উপর যে ভাল ধারণা ছিল তা তাঁর বক্তব্য থেকে বেশ পরিস্ফুট হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে আপনার

অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু ক্ষমার যোগ্য। ক্ষমা রাজোচিত ধর্ম। আমাদের সম্রাটও ক্ষমা গুণের অধিকারী বলে সর্বত্রই পূজিত। তিনি বলেছিলেন আপনার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা জগতের সকলেই জানে। সেই জন্য সর্বজনমান্য বিচার সভাও তাঁকে একপক্ষীয় মনে করতে পারে। যাই হোক, তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর মত প্রকাশ করবেন সম্রাটের আদেশের প্রতি আনুগত্যের জন্য। তিনি বলেছিলেন সম্রাটের জন্য যে কাজ আপনি করেছেন সেই বিষয় বিবেচনা করে এবং সম্রাটের মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতার জন্য তিনি মনে করেছিলেন যে যদি আপনার প্রাণরক্ষা করে আপনার দুটি চক্ষু অন্ধ করে দেওয়া হয় তা'হলে বোধ হয় ন্যায়বিচার করা হয় এবং জগতবাসী সকলেই এতে খুসী হয়ে সম্রাটের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করবে এবং তাঁর পরামর্শদাতারাও তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতার জন্য প্রংশসিত হবে। আপনি অন্ধ হলেও আপনার শারীরিক শক্তির কিছুমাত্র কমতি ঘটবে না এবং সেজন্য আপনি মহামান্য সম্রাটের পূর্ববৎ উপকারে আসবেন। আপনি অন্ধ হ'লে আমাদের কাছ থেকে বিপদের আঁচ করতে পারবেন সেজন্য আপনার সাহস আরও বেড়েই যাবে। আপনি ভেবে দেখুন কী ভাষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আপনাকে শত্রুর জাহাজের বহরটিকে টেনে আনতে হয়েছিল, আপনার চোখ বাঁচাতে গিয়ে কাজে কত বাধা পেয়েছিলেন। বড় বড় রাজারাজড়ারা মন্ত্রীদের চোখ দিয়েই দর্শন করেন, আপনিও তাই করতে পারবেন।

দরবারের কেহই এই পরামর্শ অনুমোদন করে নি। নৌ-

সেনাপতি বলগোলাম রাগ সামলাতে না পেরে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আমি আশ্চর্য হচ্ছি সচিব মহোদয় কেমন করে একজন বিশ্বাসঘাতকের প্রাণ রক্ষার সুপারিশ করতে সাহস পেলেন।" তাঁর ধারণা আপনি যেটুকু উপকার করেছিলেন সে উপকারটুকু আপনার দোষের মাত্রাই বাড়িয়েছে, আপনি যে শক্তি খর্ব করে শত্রুর নৌ-বহর ধরে এনেছিলেন আবার প্রয়োজন হলে সেই শক্তিতেই আপনি শত্রুর নৌ-বহর ফেরত পাঠাতেও পারেন। আপনি একজন ডিমের লম্বা দিক ভাঙ্গার পক্ষপাতিদের দলভুক্ত, এইটাই তাঁর ধারণা এবং যেহেতু দেশদ্রোহিতা হৃদয়েই প্রথমে বাসা বাঁধে, পরে তা কার্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তিনি সে-দিক দিয়ে বিবেচনা করে আপনাকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করেন এবং সেইজন্য তিনি আপনার মৃত্যুদণ্ডই দেবার পক্ষপাতী।

রাজকোষাধ্যক্ষও ঐ একই মত পোষণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন আপনাকে পোষবার খরচ কি সাংঘাতিক ভাবে মহামান্য সম্রাটের রাজকোষ খালি করে দিচ্ছে। শীঘ্রই এমন অবস্থা আসবে যখন রাজকোষকে আর রক্ষা করাই যাবে না। কাজেই সচিব মহোদয়ের মতলব অনুযায়ী আপনার চক্ষু উৎপাটন করলেও এ দিক দিয়ে কোন সুবিধা হবে না। সম্ভবতঃ উল্টা অবস্থাই ঘটবে, কারণ দেখা গিয়েছে যে মুরগীকে অন্ধ করে দিলে তার খাওয়া বেড়ে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি মোটা হতে থাকে। পরমপবিত্র সম্রাট বাহাদুর এবং তাঁর সভাসদবর্গ তাঁরাই আপনার বিচারক। তাঁরা তাঁদের বিবেকমত আপনাকে সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করেছেন, আপনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে তাহাই

তো যথেষ্ট। এর উপর আবার আইনকে অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য নিয়ম মাফিক প্রমাণের আর কি প্রয়োজন। মহামান্য সম্রাট বাহাদুর কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে এবং তিনি অনুগ্রহ-পূর্বক বলেছেন যে যেহেতু সভাসদবর্গ আপনাকে অন্ধ করে দেওয়া একটা সামান্য শাস্তি বলে মনে করেছেন সেহেতু পরে না হয় আর কিছু শাস্তি তিনি অনুমোদন করবেন।

রাজকোষাধ্যক্ষের আপত্তির কারণ আপনার খাওয়ার খরচ বাবদ রাজকোষ থেকে অত্যন্ত ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। তার উত্তর দেবার জন্য আপনার বন্ধু, সচিব মহোদয়, পুনরায় বলবার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কোষাধ্যক্ষ আপনার খোরাক ধীরে ধীরে কমিয়ে দিয়ে, সে বিপদের কিনারা করতে পারবেন। আপনি উপযুক্ত খাদ্যাভাবে রোগা দুর্বল হয়ে পড়বেন, ক্রমে আপনাকে অগ্নিমান্দ্য রোগে ধরবে এবং ধীরে ধীরে আপনি ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই আপনি শেষ হয়ে যাবেন। আপনার মৃতদেহটা তখন আর তেমন বিপজ্জনক থাকবে না কারণ তখন সেটা আকারে অর্ধেকে দাঁড়িয়ে যাবে। আপনার মৃত্যু ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য সম্রাটের প্রজাদের পাঁচ ছ-হাজার মিলে দু'তিন দিনের মধ্যেই আপনার মৃত দেহের মাংস কেটে কেটে গাড়ী ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে দূরবর্তী স্থানে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখতে পারবে এবং তা'হলে আর রোগ সংক্রমণ হবার ভয় থাকবে না। আর আপনার কঙ্কালটা পড়ে থাকবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে সেটা আমাদের প্রতি প্রশংসার বিজয় স্তম্ভরূপে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আপনার সচিব মহোদয়ের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্ব থাকায় ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এই ভাবে নিষ্পত্তিতে এসেছে। আপনাকে না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারবার প্রস্তাবটা খুব গোপনে রাখবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনার চক্ষু উৎপাটন করে নেবার শাস্তির আদেশ বইয়ে লেখা হয়ে গিয়েছে। এই শাস্তি বিধানে কেহই আপত্তি করে নি, একমাত্র নৌ-সৈনাধ্যক্ষ বলগোলাম ছাড়া।

তাকে আপনার নিকট হাজির হ'য়ে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও রায় পড়ে শুনাবার জন্য তিন দিনের মধ্যেই আপনার বন্ধু সচিব মহোদয়ের উপর আদেশ জারি হবে। আপনাকে মহামান্য সম্রাটের এবং রাজদরবারের আপনার প্রতি ঔদার্যের কথা বলবেন যে জন্য আপনি মাত্র চক্ষু দুটি খুইয়েই পরিত্রাণ পেলেন। মহারাজের দৃঢ়বিশ্বাস এই সামান্য শাস্তিটুকু হাসি মুখেই গ্রহণ করবেন। আপনাকে মাটিতে শুইয়ে খুব তীক্ষ্ণাগ্র তীরের দ্বারা আপনার চক্ষুতারকা ভেদ করে উৎপাটন করে নেওয়া হবে। এই অস্ত্রোপচার সুষ্ঠু ভাবে যাতে সম্পাদিত হয় সে জন্য সম্রাট বাহাদুরের বিশজন অস্ত্র চিকিৎসক উপস্থিত থাকবেন।

এইবার আমাকে উঠতে হ'বে, আমি যেমন গোপনে এসেছি তেমনি গোপনেই ফিরে যাব, লোকে যাতে সন্দেহ করতে না পারে। আমি আপনাকে সব জানালাম, এখন আপনি আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা মত যা করবার করুন।

ভদ্রমহোদয়, গোপনে স্থান ত্যাগ করবার পর সন্দেহ ও মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে আমি একা বসেছিলাম।

বিচার-সভা কোন নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান করলে এদেশের প্রথা

হচ্ছে সম্রাট বাহাদুর তাঁর পরামর্শ পরিষদে তাঁর কোমলতা ও ক্ষমা গুণের, যাহা গুণ হিসাবে সারা বিশ্বেই স্বীকৃত, কথা বলে একটি বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এ রকম বক্তৃতা দেওয়া মাত্রই তা রাজ্যময় প্রচারিত হয়। লোকে কোন কিছুকে এত ভয়ের চক্ষে দেখে না যত দেখে সম্রাটের এই ক্ষমাগুণ প্রচার বক্তৃতা। কারণ লোকে দেখেছে সম্রাট তাঁর ক্ষমাশীলতার উপর যত জোর দিয়ে বক্তৃতা করবেন শাস্তির বহরটা হবে তত বেশী নির্মম ও নিষ্ঠুর এবং যার উপর এই নির্মম ও নিষ্ঠুর দণ্ড দেওয়া হবে সে ব্যক্তি হয় তত নির্দোষ। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আমি সভাসদদের মন এবং বুদ্ধি নিয়ে জন্মাই নি বা সে পদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষাও আমার নেই। কাজেই ভাল মন্দ বিচারবোধ আমার হয়তো কমই ছিল। সেই জন্য আমি সম্রাট বাহাদুরের দণ্ডদানের ব্যাপারে কোন বদান্যতা দেখতে পাই নি বরং অত্যন্ত কঠোর বলেই আমার মনে হয়েছিল, হতে পারে হয় তো আমারই ভুল।

মাঝে মাঝে আমার বিচারে দাঁড়াবার কথা মনে হয়েছিল। যদিও অভিযোগগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আমার অস্বীকার করবার কিছু ছিল না তাহলেও আমি আশা করেছিলাম আমার কাজের পক্ষে ভাল জবাব রয়েছে। আমি কিন্তু এই বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে সাহস করি নি অবস্থার জটিলতা ও শত্রু অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বিবেচনা করে। একবার প্রতিরোধ করবার আমার কঠিন ইচ্ছা হয়েছিল। আমি যখন মুক্ত রয়েছি তখন সারা সাম্রাজ্যের শক্তিও আমাকে কাবু করতে পারবে না। আমি অনায়াসে পাথর ছুঁড়ে শহর ভেঙ্গে খান খান করে দেব। কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে আমি আমার

ঐ মতলব পরিত্যাগ করেছিলাম। আমি আমার সম্রাট বাহাদুরের কাছে আমার শপথ নেওয়ার কথা মনে করেছিলাম, তাঁর কাছে যে অনুগ্রহ লাভ করেছি সে কথা আমার স্মরণ হয়েছিল এবং আমাকে "নরদক" এই উচ্চ সম্মানের উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন—সে কথা আমার মনে হয়েছিল। সভাসদদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধারাটি আমি তখনও শিখে উঠতে পারিনি, তা না হ'লে মহারাজের আমার প্রতি বর্তমান কঠিন ব্যবস্থাই তাঁর প্রতি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতাবোধের কারণগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে আমি মনে করতে পারতাম।

আমার চক্ষু দুটিকে রক্ষা করতে হবে, কাজেই আমাকে মুক্ত থাকতে হবে—এই চিন্তাই শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা সমাধানে পৌঁছে দিয়েছিল। ব্লিফাস্কু সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার অনুমতি আমি মহামান্য সম্রাটের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পূর্বেই আমি এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিলাম। আমি আমার বন্ধু সচিব মহোদয়কে একখানি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিয়ে সোজা যেখানে আমাদের নৌ-তরীসমূহ থাকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে পত্রের জবাবের জন্য আমি অপেক্ষা করিনি। আমি সেই পত্রে সচিব মহোদয়কে শুধু জানিয়ে দিলাম যে আমি প্রত্যুষেই ব্লিফাস্কু রাজ্যের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি, যে অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়েছে সেই অনুমত্যানুসারে আমি একখানি বড় যুদ্ধ জাহাজকে দখল করেছিলাম এবং একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার নঙ্গর তুলে দিয়েছিলাম, আমি পোশাক খুলে জাহাজে রেখে দিয়েছিলাম, তারপর

জাহাজ টেনে নিয়ে কখনও সাঁতার দিয়ে কখনও জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আমি ব্লিফাস্কুর রাজকীয় বন্দরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোকেরা আমার আগমন প্রতীক্ষা অনেকদিন থেকেই করছিল। তারা আমাকে পথপ্রদর্শক দিয়েছিল আমাকে রাজধানীতে পৌঁছে দেবার জন্য। রাজধানীর নামও ব্লিফাস্কু। আমি তাঁহাদের হাতের উপর তুলে নিয়ে পথ অতিক্রম করেছিলাম এবং দেউড়ীর দুশো গজের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে তাদের নামিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম কোন একজন সচিবকে আমার আগমন বার্তাটি জানাবার জন্য এবং একথা জানাবার জন্য যে আমি মহামান্য সম্রাটের আদেশের অপেক্ষায় আছি। আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই উত্তর পেয়েছিলাম যে মহামান্য সম্রাট বাহাদুর তাঁর পরিবারপরিজন পরিবৃত হয়ে এবং রাজদরবারের বড় বড় কর্মচারিদের সমভিব্যাহারে আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য আসছেন। আমি একশো গজ পথ আরও দেউড়ীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। সম্রাট বাহাদুর এবং অন্যান্য সকলে তাঁদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন, মহারানী ও অন্যান্য মহিলারা তাঁদের ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমেছিলেন। আমার তাদের দেখে মনে হয়নি যে তাঁরা আমাকে দেখে কোন রকম ভয় পেয়েছেন। আমি সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর হস্ত চুম্বন করবার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়েছিলাম। আমি সম্রাট বাহাদুরকে জানিয়েছিলাম আমি পরাক্রমশালী সম্রাটকে দর্শন করতে আসব বলেছিলাম সেই মত আমি আমার সম্রাটের অনুমতি নিয়ে এসেছি। আমি শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী এবং আমার সম্রাটের প্রতি আমার কর্তব্যের

পরিপন্থী না হলে যে কোন কাজে আমি সম্রাট বাহাদুরকে সাহায্য করবো। আমি আমার সাম্প্রতিক অবমাননার কথা কিছুই বলিনি কারণ আমি নিয়ম মত কোন সংবাদ পাইনি, কাজেই সে সব বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—একথা মনে করবার অধিকার ছিল।

আমি পাঠককে এখানকার রাজদরবার কি ভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন তার বিশদ বিবরণ দিয়ে আর বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। সেটা রাজার বদান্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ই হয়েছিল। আমি থাকবার জন্য এখানে কোন ঘর না পাওয়ায় এবং কোন বিছানা না পাওয়ায় আমাকে কম্বল মুড়ি দিয়ে মাটিতে শুতে হয়েছিল। সে সব অসুবিধার কথা আর বেশী বলে পাঠকের বিরক্তি জন্মাতে চাই না।

অষ্টম অধ্যায়

ব্লিফাস্কু দ্বীপে পৌঁছাবার তিন দিন পরে অনুসন্ধিৎসু হয়ে আমি দ্বীপের উত্তরপূর্ব দিকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি সমুদ্রের মধ্যে তীর থেকে আধ লিগ দূরে একটা নৌকা উল্টিয়ে গিয়ে ভাসতে দেখেছিলাম। আমি আমার জুতা ও মোজা খুলে জলে নেমে দু'তিন শো গজ সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিলাম। জিনিসটা ততক্ষণে সমুদ্রের স্রোতের টানে আরও কাছে এসে পৌঁছেছিল। আমি তখন বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখতে পেয়েছিলাম যে জিনিসটা সত্যই একখানা আমাদের দেশের নৌকা। আমার মনে হয়েছিল বোধ হয় ঝড়ে জাহাজের গা থেকে খসে এদিকে ভেসে এসেছে। আমি শহরে ফিরে গিয়ে মহামান্য সম্রাটের কাছে তার যুদ্ধে নষ্ট হওয়ার পর অবশিষ্ট যে জাহাজগুলি আছে তার মধ্যে থেকে বিশখানি সব থেকে লম্বা জাহাজ আমাকে ধারস্বরূপ দিতে অনুরোধ করেছিলাম এবং তাঁর সহকারী নৌ-অধ্যক্ষের অধীনে তিন হাজার নাবিককে পাঠাতে বলেছিলাম। এই নৌ-বহরটা ঘুরে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওনা হয়েছিল। আমি সোজা পথে সমুদ্রের কূলে যেখানে নৌকাখানি দেখেছিলাম সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। নৌকাখানি সমুদ্রের

স্রোতে আরও কিনারে এসে ভিড়েছিল। নাবিকদের সকলের হাতেই দড়ি ছিল, সে দড়ি আমি পূর্বেই বেশ শক্ত করে পাকিয়ে দিয়েছিলাম। জাহাজগুলি এসে পৌঁছলে আমি জামা-কাপড় ছেড়ে জলে নেমে পড়েছিলাম এবং জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে নৌকাখানার একশো গজ কাছে পৌঁছেছিলাম। তারপর সাঁতার দিয়ে গিয়ে আমি নৌকাখানির কাছে পৌঁছেছিলাম। নাবিকরা আমাকে তাদের দড়ির প্রান্তভাগ ছুঁড়ে দিয়েছিল। আমি তা দিয়ে নৌকার মাথার দিকের ফোঁকরে বেঁধেছিলাম এবং অপর দিকটা একটা জাহাজে বেঁধে দিয়েছিলাম। সুবাতাস বহিতে থাকায় নাবিকরা টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং আমিও নৌকাখানিকে টেনেছিলাম। এইভাবে আমরা কিনারার চল্লিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তারপর আমরা জোয়ার নেমে যাবার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। জোয়ার নেমে গেলে নৌকাখানি ডাঙায় পড়েছিল। তখন দু' হাজার লোক দিয়ে দড়ি এবং যন্ত্রের সাহায্যে নৌকাখানিকে উল্‌টিয়ে সোজা করা হয়েছিল। সোজা করার পর আমি দেখতে পেয়েছিলাম নৌকার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। আমি আর পাঠককে আমার অসুবিধার কথা বলে বিরক্ত করবো না। আমার দশদিন লেগে গিয়েছিল ব্লিফাস্‌কুর রাজকীয় বন্দরে নৌকাখানি নিয়ে পৌঁছাতে। আমি সেখানে পৌঁছালে একটা বিরাট জনসমাগম সেখানে হয়েছিল। আমার সেই বিরাট নৌকাখানি দর্শন করে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়েছিল। আমি সম্রাটকে জানিয়েছিলাম যে আমার সৌভাগ্যবশতঃই আমি নৌকাখানি পেয়েছি। এই নৌকা চড়েই আমি এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারব যেখান থেকে আমি আমার

স্বদেশে ফিরতে পারব। আমি নৌকাখানিকে ঠিক মত সাজিয়ে নেবার জন্য মহারাজের কাছে তদ্ উপযুক্ত জিনিসপত্রের জোগাড় চেয়েছিলাম। এবং যাত্রা করবারও অনুমতি চেয়েছিলাম। কিছু ওজর আপত্তি তোলার পর তিনি অনুগ্রহপূর্বক সে অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম যে ইতিমধ্যে আমার নামে সম্রাটের কাছ থেকে ব্লিফাস্কুর দরবারে কোন চিঠিপত্র এসে পৌঁছায়নি। পরে আমি অবশ্য গোপনে জানতে পেরেছিলাম যে লিলিপুটের সম্রাট বাহাদুর ভাবতেই পারেননি যে আমি তাঁর মতলবের বিষয় পূর্বাহ্নেই অবগত হয়েছিলাম। তিনি ভেবেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে আমি আমার কথা রাখবার জন্যই ব্লিফাস্‌কু রাজ্যে এসেছি। যে জন্য তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের দরবারের সকলেই জ্ঞাত ছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে আমি দেখা-সাক্ষাত সেরে শীঘ্রই আবার ফিরে যাব। আমার দেরী দেখে তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য মন্ত্রিসভার সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে একজন উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোককে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অনুলিপি দিয়ে ব্লিফাস্‌কু রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন। এই রাজদূত তার উপর নির্দেশ মত ব্লিফাস্‌কু সম্রাটের কাছে আমার উপর অত্যন্ত করুণা প্রকাশ করে আমার অপরাধের গুরুত্বের তুলনায় মাত্র আমার চক্ষু দুটি তুলে নেওয়া হবে এই সামান্য শাস্তিটুকু দেওয়া হয়েছে এই কথা তিনি রাজদরবারে প্রকাশ করেছিলেন। আমি ন্যায়ের বিধান না মেনে পালিয়ে

এসেছি, এখন আমি যদি ছু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না যাই তা হ'লে আমার "নরদক" উপাধি কেড়ে নেওয়া হবে—আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রচার করা হবে। রাজদূত আরও জানিয়েছিল যে দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখবার জন্য তাঁর প্রভু আশা করেন যে তাঁর ভ্রাতৃতুল্য ব্লিফাস্কুরাজ আমাকে হাত পা বেঁধে লিলিপুটে পাঠিয়ে দেবার জন্য আদেশ দেবেন, সেখানে আমাকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে শাস্তি দেওয়া হবে।

তিন দিন ধরে পরামর্শক্রমে ব্লিফাস্কু দেশের সম্রাট অনেক ভদ্রতা ও ক্ষমা প্রকাশ করে পত্রের জবাব পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে আমাকে বেঁধে পাঠান যে কত অসম্ভব তা লিলিপুট সম্রাটের অজ্ঞাত নয়। যদিও আমি তাঁর অনেক যুদ্ধ জাহাজ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছি কিন্তু আমি দুই দেশের মধ্যে শান্তি আনয়ন করবার পক্ষে অনেক সহায়তাও করেছি। আমি একটা বিরাট জাহাজ সমুদ্র উপকূলে পেয়েছি যাতে আরোহণ করে আমি সমুদ্র পাড়ি দিতে পারব এবং দুই দেশের সম্রাটদ্বয় নিরুদ্বিগ্ন হতে পারবেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে দুই দেশই শীঘ্র আমাকে পোষার গুরুভার থেকে অব্যাহতি পাবে এবং তদুদ্দেশে আমার সেই জাহাজখানিকে আমার সাহায্যে এবং নির্দেশ মত সমুদ্র গমনের উপযুক্ত করে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এই উত্তর নিয়ে রাজদূত দেশে ফিরে গিয়েছিল। ব্লিফাস্কু সম্রাট আমাকে গোপনে সবই জানিয়েছিলেন এবং আমাকে তিনি নিরাপদে রাখবেন একথাও বলেছিলেন, যদি আমি তাঁর চাকরি গ্রহণ করি। যদিও আমি তাঁকে এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে

করেছিলাম তবুও আমি রাজারাজড়াদের উপর বা তাঁদের মন্ত্রীদের উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করতে ভরসা পাইনি। কাজেই, আমি তাঁর সৎ উদ্দেশ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমাকে ক্ষমা করতে বলেছিলাম। ভাগ্যে ভাল মন্দ যাই থাকুক, আমি যখন দৈবক্রমে সমুদ্রে পাড়ি দেবার মত একখানি নৌকা পেয়েছি, তখন আর আমি আমার জন্য দুটি মহান দেশের মধ্যে ঝগড়া-দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে থাকব না। আমি মহারাজকে এতে অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি, বরং আমি ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছিলাম যে, তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী আমার সংকল্পে খুসিই হয়েছিলেন।

আমি যত শীঘ্র সম্ভব চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম, রাজ-দরবারও আমাকে বিদায় দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাদির বন্দোবস্ত করেছিল। পাঁচশ লোক লাগিয়ে আমার নৌকার পাল প্রস্তুত করান হয়েছিল আমার নির্দেশ মত। শক্ত কাপড় তের ভাঁজ করে নিয়ে সেলাই করে তা তৈরী হয়েছিল। আমাকে নিজেই কষ্ট করে দড়িগুলি তৈরী করে নিতে হয়েছিল। সেজন্য আমাকে দশ ফেরতা, বিশ ফেরতা ও ত্রিশ ফেরতা শক্ত দড়ি নিয়ে পাকাতে হয়েছিল। একখানি বড় পাথর আমি দৈবচক্রে সমুদ্রকূলে পেয়েছিলাম, সেখানাই আমার নৌকার নঙ্গর-এর জন্য ব্যবহার করব বলে নিয়েছিলাম। আমি তিনশটা গরুর চর্বি দিয়ে আমার নৌকা ও অন্যান্য জিনিসে মাখিয়ে নিয়েছিলাম। আমাকে আমার নৌকার হাল দাঁড় ও মাস্তুল প্রস্তুত করে নেবার জন্য রাজকীয় উদ্যান থেকে সব থেকে বড় বড় গাছ অনেকগুলো কেটে নিয়ে আসতে হয়েছিল। আমি সেগুলোকে

মোটামুটি ভাবে জুড়ে তৈরী করে দেবার পর মহারাজার জাহাজ নির্মাণকারী সূত্রধররা তা ভাল করে সাফ-সুতরো করে দিয়েছিল।

মাস খানেক পরে যখন সব প্রস্তুত, আমি সম্রাট বাহাদুরের নিকট বিদায় নেবার জন্য গিয়েছিলাম। সম্রাট এবং তাঁর পরিজন-বর্গ রাজপ্রাসাদ থেকে বার হয়ে এসেছিলেন। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম সম্রাট বাহাদুরের, সম্রাজ্ঞীর, ছেলেমেয়েদের হস্ত চুম্বন করবার জন্য। তাঁরা আমাকে তা অনুগ্রহপূর্বক করতে দিয়েছিলেন। মহামান্য সম্রাট আমাকে পঞ্চাশটা স্বর্ণমুদ্রার থলি, তাঁর একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি উপহার দিয়েছিলেন। আমি সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে জামার একটা থলিতে ভরে ফেলেছিলাম যাতে সেগুলোর কোন ক্ষতি না হতে পারে। আমার বিদায় ক্ষণে অনেক অনুষ্ঠানাদি হয়েছিল—সে সব বলে আর পাঠককে বিরক্ত করতে চাই না।

আমি আমার নৌকাখানির খোলে একশ ষাঁড় মেরে ভর্তি করে নিয়েছিলাম। তিনশ ভেড়াও নিয়েছিলাম আর তদুপযুক্ত রুটি এবং পানীয় নিয়েছিলাম। চার'শ রাঁধুনি রান্না করে দিতে পেরেছিল যতটুকু মাংস সবটুকুই সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাব বলে ছয়টা গরু ও দুটো ষাঁড় জীবন্ত নিয়েছিলাম এবং সমসংখ্যক ভেড়া এবং ভেড়ী নিয়েছিলাম দেশে নিয়ে যাব মনে করে। দেশে নিয়ে গিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি করাব মনে করেছিলাম। তাদের খাদ্য হিসাবে কিছু ভাল শুক্‌না ঘাস ও কিছু শস্য নিয়েছিলাম। আমি গোটা বার ঐ দেশী মানুষও সঙ্গে নেব মনে করেছিলাম কিন্তু মহামান্য সম্রাট বাহাদুর

কোনক্রমেই তার অনুমতি দেননি। সম্রাট বাহাদুর আমার পকেট ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখতে বলেছিলেন এবং তা করেও আবার আমার সম্মানের দোহাই দিয়ে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন তাঁর কোন প্রজাকে ধরে নিয়ে না যাই এবং যদি কেহ স্ব-ইচ্ছায় যেতে চায় তা হলেও যেন নিয়ে না যাই।

এই ভাবে সমস্ত যোগাড়যন্ত্র সমাধা হলে পর আমি ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের চব্বিশ তারিখে বেলা ছ'টার সময় ব্লিকাস্কু থেকে আমার নৌকা ছেড়েছিলাম। আমি যখন উত্তর-মুখো চার লিগ পথ পাড়ি দিয়েছিলাম তখন আমি একটা দ্বীপ আমার উত্তর পশ্চিমে আধ লিগ দূরে দেখতে পেয়েছিলাম। আমি সোজা এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং দ্বীপটির পশ্চিমদিকে নঙ্গর ফেলেছিলাম। দ্বীপটি দেখে মনে হয়েছিল বসতিশূন্য। আমি কিছু খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলাম। আমার বেশ ঘুম হয়েছিল। আমার মনে হয় আমি প্রায় ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। কারণ আমার ঘুম ভাঙবার দুই ঘণ্টা পর সকাল হয়েছিল। রাতটা বেশ পরিষ্কার ছিল। সূর্য উঠবার পূর্বেই আমি প্রাতরাশ সেরে নিয়েছিলাম এবং বাতাস অনুকূল থাকায় আমি নঙ্গর তুলেছিলাম এবং যে মুখো চলছিলাম সেই মুখেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পকেট-দিকনির্দেশক যন্ত্রটি সে-দিক দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিল। ভ্যান ভি মেনস্ দেশের উত্তর-পূর্বে কোন দ্বীপে পৌঁছাবার আমার ইচ্ছা ছিল।

সারাদিন কোন কিছুই দেখতে পাইনি। পরদিন বেলা নাগাত, তিনটে আমার হিসাব মত, যখন আমি ব্লিফাস্কু থেকে চব্বিশ

লিগ দূরে চলে এসেছি সেই সময় আমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগুচ্ছে এমন একখানা জাহাজ লক্ষ্য করেছিলাম। আমি তখন খাড়া পূবমুখো চলছিলাম। আমি চিৎকার করে তাকে ডেকেছিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। আমি ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম কারণ বাতাস তখন পড়ে গিয়েছিল। আমি আমার সব কখানা পাল তুলে দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং আধঘণ্টার মধ্যেই ঐ জাহাজখানি আমাকে দেখতে পেয়েছিল। জাহাজখানি তার পতাকা বিস্তার করে ধরেছিল এবং একবার কামান দেগেছিল। আমি আবার আমার দেশকে দেখতে পাব এবং আমার প্রিয়জনদের দেখতে পাব এই অপ্রত্যাশিত আশার যে কি আনন্দ তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জাহাজখানি তার গতি মন্থর করেছিল এবং আমি তার পাশে এসে পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। সেদিন সেপ্টেম্বর মাসের ২৬শে তারিখ। আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল যখন আমি দেখলাম যে জাহাজখানি ইংলণ্ডের।

আমি আমার গরু ও ভেড়াগুলিকে পকেটে নিয়ে এবং আমার সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠেছিলাম। জাহাজে আমি আমার এক পুরাতন বন্ধুকে দেখতে পেয়েছিলাম। তার নাম পিটার উইলিয়ামস। সে জাহাজের অধ্যক্ষের কাছে আমার সৎস্বভাবের কথা বলেছিল। এই ভদ্রলোক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন শেষ কোথা থেকে রওনা হয়ে আসছি এবং কোথায় আমি যাব। সংক্ষেপে আমি তাঁর জবাব দিয়েছিলাম কিন্তু আমার জবাব শুনে

তাঁর মনে হয়েছিল আমার কথাগুলি পাগলের উক্তি ছাড়া আর কিছু নয় এবং অত্যন্ত বিপদ আপদের মধ্যে পড়ে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। আমি আমার পকেট থেকে গরু এবং ভেড়াগুলি বা'র করে টেবিলে রাখায় তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল এবং আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছিল। ব্লিফাস্কু সম্রাট আমাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন এবং তাঁর পূর্ণ প্রতিকৃতি ও অন্যান্য জিনিস আমি তাঁকে দেখিয়েছিলাম। আমি তাঁকে প্রতিটি থলিতে দুশো স্প্রাগ মুদ্রা বোঝাই এমন দুটি থলে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ইংলণ্ডে পৌঁছে আমি তাঁকে একটা গরু ও একটা ভেড়া উপহার দেব। আমাদের সমুদ্র যাত্রা নির্বিঘ্নে কেটেছিল।

১৭০২ সালের এপ্রিল মাসের তের তারিখে আমরা ডনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। জাহাজের ইন্দুরে আমার ভেড়াগুলির একটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তার হাড়গুলো একটা গর্তের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম। মাংসের থেকে হাড়গুলো পরিষ্কার বেছে তুলে ফেলেছিল। বাকি গরু ভেড়াগুলো নিয়ে আমি নিরাপদেই ডাঙ্গায় নেমেছিলাম এবং গ্রিন্‌উইচের সবুজ ঘাসপূর্ণ মাঠে তাদের চরবার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওখানকার সুন্দর সরু সরু ঘাস তারা পেট পুরে খেয়েছিল। আমার কিন্তু ভয় ছিল উল্টা বিপত্তির। আমি তাদের সমুদ্র যাত্রার লম্বা সময় বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম না যদি জাহাজের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর ভাল বিস্কুটের কিছু আমাকে না দিতেন। ঐ বিস্কুট ভাল করে গুঁড়ো করে জল দিয়ে গুলে তাদের সর্বদাই খাওয়ান হত। যে সামান্য সময় আমি ইংলণ্ডে ছিলাম এই সমস্ত গরু

ভেড়া দেখিয়ে আমি বেশ দু পয়সা লাভ করেছিলাম। আমি দ্বিতীয়বার সমুদ্র যাত্রায় বা'র হবার পূর্বে গরু ভেড়াগুলিকে ছয়শত পাউণ্ডে বেচে দিয়েছিলাম। আমি আবার ফিরে এসে দেখেছিলাম ঐ জাতের গরু ভেড়ার বেশ বংশ বৃদ্ধি হয়েছে, বিশেষ করে ভেড়াগুলির। আমি আশা করি পশম শিল্পের তার দ্বারা বিশেষ উন্নতি হবে কারণ এই পশম অতি সূক্ষ্ম ও মোলায়েম।

আমি আমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের সঙ্গে দুমাস বাস করেছিলাম তারপর বিদেশ ভ্রমণের আগ্রহ আমাকে আর তিষ্ঠতে দেয়নি। আমি আমার স্ত্রীর হাতে পনের শত পাউণ্ড রেখে এবং রেডরিকের একটা সুন্দর বাড়ীতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে আমার বাকি টাকা পয়সা—কিছু টাকায় ও কিছু মাল সঙ্গে নিয়ে আমার ভাগ্যের উন্নতির আশায় আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলাম। আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে এবং পুত্র-কন্যাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। দুপক্ষই চোখের জল ফেলেছিল। তিন শত টনের পণ্যবাহী জাহাজ অ্যাড্‌ভেনচারে গিয়ে আমি উঠেছিলাম। অ্যাড্‌ভেনচার সুরাটে যাচ্ছিল। আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত দ্বিতীয় ভাগে বর্ণনা করবো।

—প্রথম জলযাত্রা শেষ—

গ্যালিভারের দ্বিতীয়বার জলযাত্রা

দৈত্যমানবের দেশে



দ্বিতীয় খণ্ড

দৈত্যমানবের দেশে

প্রথম অধ্যায়

আমার ভাগ্য বিড়ম্বনা শেষ হল না। ফিরে আসবার দু'মাস পরেই আবার আমি দেশ ছাড়লাম। ক্যাপটেন নিকোলাস যাচ্ছিলেন সুরাট। সেটা ১৭০২ সালের মাঝামাঝি সময়। আমিও চললাম নিকোলাসের সঙ্গে। উত্তমাশা অন্তরীপ হ'য়ে আমরা ছাড়লাম মাদাগাস্কার। এ পর্যন্ত এক রকম ভালোই কেটে-ছিল। কিন্তু তারপরই প্রায় কুড়িদিন ধরে নিরন্তর ঝড়-ঝঞ্ঝায় আমাদের জাহাজ ঠেলে নিয়ে গেল,—প্রায় মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি।

এই সময়ে আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক হ'ল—পানীয় জলের অভাব। ঠিক এক বছর আগে এই জুন মাসেই বেরিয়েছিলাম আমরা জাহাজ নিয়ে। আর এক জুন ঘুরে এল। এমন জলকষ্ট হয় নি এর আগে। চতুর্দিকেই জল কিন্তু এক ফোঁটাও মুখে দেওয়ার উপায় নেই।

অবশেষে একটি ছেলে মাস্তুলের মাথায় উঠে আবিষ্কার করল—জাহাজখানি একটা ডাঙ্গার কাছাকাছি এসে গেছে।

তখনই নোঙ্গর ফেলা হল। ক্যাপটেন বারজন লোককে দস্তুরমত অস্ত্রশস্ত্র আর জল রাখবার জালা দিয়ে নৌকায় পাঠালেন—ডাঙ্গার দিকে, যদি কোথায়ও পানীয় জল খুঁজে বের করা যায়। আমারও

ইচ্ছা হ'ল, ওদের সঙ্গে গিয়ে দেশটাকে দেখে আসি ভাল করে।

কিন্তু ডাঙ্গায় নেমে আমরা কোন নদী, ঝরনা বা মনুষ্য বসতির কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। আমাদের লোকগুলি তখন খুঁজতে গেল—কোথায়ও জল মেলে কিনা, আমিও মাইল খানেক চলে গেলাম অন্য দিকে। পরিশ্রান্ত হ'য়ে যখন ফিরব ভাবছি, তখন একটা উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে দেখলাম, আমাদের লোকেরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিল সমুদ্রের জলে।

আমি ছুটে গিয়ে তাদের ধরব, এমন সময় দেখি, একটা বিরাটাকার দৈত্য তাদের ধরবার জন্য সমুদ্রের মধ্যে নেমে পড়েছে। কিন্তু ওরা এত জোরে নৌকা চালিয়ে দিল যে, দৈত্যটি তাদের ধরতে পারল না।

এরপর পালানো ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলাম না। কোথায়ই বা পালাব ? তাড়াতাড়ি একটা খাড়া পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় গিয়ে উঠে বসলাম। এখান থেকে চারিদিক বেশ ভালোই দেখা গেল। চাষ আবাদ প্রচুর হয় এখানে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম আমি এখানকার ঘাস দেখে। ঘাসগুলি প্রায় দশ-বার হাত খাড়াই।

এরপর ক্ষেতের ভিতর দিয়ে একটা খুব বড় রাস্তা দেখে আমি রওনা দিলাম সেই পথে। দু'ধারে শস্যগাছগুলি প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ হাত লম্বা। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আমি মাঠের শেষে এসে পৌঁছলাম। এখানে যে সব গাছ দিয়ে বেড়া দেওয়া হ'য়েছে

সেগুলি চল্লিশ হাতের কম উঁচু নয়। এর পরই আর একটা মাঠ। এই মাঠে যেতে সিঁড়ি দেওয়া পথ আছে। ঐ সিঁড়ির এক একটা ধাপ ছ'ফুটের কম উঁচু নয়; কাজেই ঐ সিঁড়ি বেয়ে উঠা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ঠিক এমনি সময় দেখলাম. যে দৈত্যটা নৌকার পিছু নিয়েছিল, ঠিক তেমনি ধারা একটি দৈত্যমানব সামনের মাঠ থেকে সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে! একটা মন্দিরের সমান সে উঁচু আর এক একটা পদক্ষেপে সে প্রায় দশ ফিট করে চলে; তাকে দেখেই আমার আক্কেল গুড়ুম। বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল ভয়ে। গলাটা শুকিয়ে এল। আমি কাঁপতে কাঁপতে পাশের শস্যক্ষেতের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

ঐ সিঁড়ির উপর উঠে দৈত্যটা কাদের যেন ডাকল। বাপরে! কণ্ঠস্বর ত নয়, যেন ঢাকের বাদ্যি! তার ডাক শুনে আরও ছ-সাতটি দৈত্য মাঠের ভিতর থেকে এসে জুটল। ওদের চেহারাও ওর মতই। হাতে তাদের একখানা কাস্তে। আমাদের কাস্তের ছ'সাত গুণ বড় হবে এদের এই কাস্তেগুলি। প্রথম দৈত্যটার নির্দেশমত ওরা মাঠের শস্য কাটতে গেল; কিন্তু হায় আমার কপাল!—যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়! আমি যেখানে লুকিয়ে আছি ঠিক সেই ক্ষেতের শস্য কাটতেই ওরা নামল যে!

হাত-পা অবশ হ'য়ে আসছে আমার। শুয়ে পড়লাম মাটিতে। ভাবলাম, বন্ধু-বান্ধবের কথা না শুনে কেন এই দুর্মতি হল আমার। কেন আমি আবার সমুদ্র যাত্রায় নামলাম! মনে পড়ল লিলিপুটের

কথা। কি সুখেই না ছিলাম সেখানে! সেখানকার লোকেরা ভাবত আমাকে জগতের বৃহত্তম আর শ্রেষ্ঠতম জীব! হাতের মুঠোর মধ্যে দড়িগুলি ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছি আমি তাদের যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে। তাদের দেখে মনে মনে হেসেছি। আর আজ?

পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেক কাছে। ঐ ত' একটি দৈত্যমানব এগিয়ে আসছে আমারই দিকে। তার দৃষ্টি রয়েছে উপরে। আমাকে সে হয়ত দেখতেই পাবে না। কিন্তু আমাকে যদি মাড়িয়ে যায়—অথবা তার হাতের ঐ বিরাট কাস্তেখানি দিয়ে যদি দুখণ্ড করে যায় আমাকে! ঐ যে এসে পড়েছে! একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লাম আমি তার পায়ের কাছে।

ইঁদুরের কিচির মিচির শুনলে আমরা যেমন তাকাই, লোকটিও তেমনি হঠাৎ থমকে গিয়ে তাকাতে লাগল, এদিকে ওদিকে। আমাকে অবশেষে দেখতে পেয়ে অতি সন্তর্পণে ধরতে গেল আমাকে—আমরা যেমন করে জঙ্গলের মধ্যে খরগোশ কি বেজীর বাচ্চা দেখলে ধরতে যাই। তার চোখের কাছে এনে ভাল করে দেখতে লাগল আমাকে। তার মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, সে আমাকে একটা তাজ্জব জীব মনে করেছে!

কিন্তু রাখাল ছেলেরা যেমন করে গাং-শালিকের বাচ্চাকে ধরে আছাড় মারে, ও যদি তেমনি করে আছাড় দেয় আমাকে?

হাত জোড় করে আমি অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলাম তার কাছে। আমার ভাষা সে বুঝল না কিছুই কিন্তু আমি যে একটা

কিছু বলতে চাচ্ছি তা সে বেশ বুঝল। তার আঙ্গুলের চাপে আমার কষ্ট হ'চ্ছিল খুব। কিন্তু যখন বুঝল, আমি নিরীহ জীব, তখন খুব সন্তর্পণে সে আমাকে তার কোটের পকেটের মধ্যে রেখে ছুটে চলল তার প্রভুর কাছে—যাকে আমি সর্বপ্রথম দেখেছিলাম এই মাঠে। কি সব বলে সে আমাকে বের করল তার পকেট থেকে। সে নিশ্চয় ভেবেছিল, আমি একটা চারপেয়ে জীব। তাই সে আমার পিঠটা ধরে উপুড় করে ছেড়ে দিল মাটিতে। দেখতে না দেখতে আর আর কৃষকরাও এসে গোল হ'য়ে বসল সেখানে।

আমাকে ছেড়ে দেওয়া মাত্রই আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম, খানিকটা এগিয়ে গেলাম আবার পেছিয়ে এলাম। মাথার টুপি খুলে আমি কর্তাকে অভিবাদন করলাম। হাঁটু গেড়ে বসে এবং হাত জোড় করে আমি বিনয়ের সুরে কাতরভাবে বললাম, আমাকে যেন তারা না মারে।

লোকটি বুদ্ধিমান। সে বুঝল, আমি একটি বিচারবুদ্ধিশালী প্রাণী। সেও আমাকে কি বলতে চাইল, কিন্তু তার গলার আওয়াজ আমার কানে তালা লাগবার উপক্রম করেছিল—আমি কিছুই বুঝতে পারি নি তার কথা।

অবশেষে লোকটি তার পকেট থেকে রুমালখানা বের করে দু'ভাজ করে তার বাঁ-হাতের তালুর উপর পাতল এবং আমাকে ইঙ্গিতে বলল তার উপর উঠতে। আমি উঠে বসলাম এবং সে আমাকে তার বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল। মজুরদের বলল যার যার কাজে নামতে। বাড়ী গিয়ে লোকটি তার স্ত্রীকে ডাকল। বোধ

হয় তাকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাবে বলে পকেট থেকে আমাকে বের করল। কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র তার স্ত্রী ভয়ে চিৎকার করে উঠল—আমাদের মেয়েছেলেরা ব্যাং কি মাকড়সা দেখলে যেমন করে!

কিন্তু স্বামী যখন দেখিয়ে দিল আমি কত শান্ত এবং কেমন তাঁর কথা শুনি, তখন সে আর ভয় পেল না। এমন কি, আমার উপর তার সদয় ভাবটা পরিষ্কার ফুটে উঠল।

দুপুর বেলায় সকলে খেতে বসল। আমাকেও খেতে দিল একখানা ছোট থালায়—থালাটা তাদের কাছে ছোট, তার পরিধি হবে হাত চারেকের কম নয়! জলের গেলাসটা একটা ঘড়ার সমান বললেও হয়। এটাই তাদের সবচেয়ে ছোট গেলাস। কোন রকমে দু'হাত দিয়ে তুলে নিয়ে খেলাম ঐ গেলাস থেকে। ঐ কৃষকের ছোট ছেলেটির বয়স বছর দশেক হবে। ছেলেটি বড় চঞ্চল আর নিষ্ঠুর। আমার পা দুটি একসঙ্গে ধরে খেলনা পুতুলের মত সে আমাকে উপরে তুলে ধরল। আমার পা দুখানি ভাঙ্গে আর কি! ভয়ে আমি একটা কাতর শব্দ করে উঠলাম। কৃষকটি ছুটে এসে ছেলেটিকে মারল এক থাপ্পড়। তারপর আমার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমি তখনও ভয়ে কাঁপছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে সেই কৃষক পত্নীর আদুরে বিড়াল এসে উপস্থিত সেখানে। বিড়াল ত নয় যেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! তাকে দেখেই ত আমার চক্ষু স্থির। কিন্তু আমি জানতাম, কুকুর, বিড়াল কি গরুকে ভয় করলে সে বেশি পেয়ে বসে। তাকে গ্রাহ্যই

করি না এই ভাবে আমি গট্ গট্ করে কয়েকবার তার সমুখ দিয়ে আসা-যাওয়া করলাম। ফল হলো ঠিক উল্টো—বিড়ালটাই দেখি আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে! সে তাড়াতাড়ি কৃষক পত্নীর কোলের মধ্যে গিয়ে বসে সভয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগল।

বিকালের দিকে এলেন একজন ধাই মা। কোলে তার বছর-খানেকের একটি শিশু। সেও বেয়াদপ কম নয়। এসেই হাত বাড়িয়ে আমাকে নিতে চায় সে। ধাইটি কোথায় তাকে নিরস্ত করবে, না আমার মাজাটি ধরে তুলে দিল ঐ শিশুর হাতে।

শিশুর স্বভাবই এই যে, সে ছুনিয়শুদ্ধ মুখের মধ্যে পুরতে চায়। আমার মাথাটিও পুরে দিল তার মুখে। আমি গোঁ গোঁ শব্দ করতেই সে ভয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল আমাকে—ভাগ্যিস কৃষক পত্নী এসে ধরে ফেললো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আমার ঘুম পাচ্ছে বুঝতে পেরে কৃষক পত্নী তার খাটের ওপর শুইয়ে দিল আমাকে। তারপর নৌকার পালের মত একটা চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দিল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, যেন আমি আমার বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শুয়ে আছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা বড় রকম ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, আমি প্রায় একশো হাত লম্বা আর পঁচাত্তর হাত উঁচু একটা ঘরের খাটের উপর শুয়ে আছি। খাটখানি চওড়ায় চৌদ্দ-পনর হাত হবে। ওটা মেঝে থেকে প্রায় আট ফুট উঁচু।

শব্দটি কিসের তা পরে বুঝলাম। দুটি ইঁদুর ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে দেখলাম। বড় একটা শূয়োরের মত তাদের আকৃতি। আমি লাফ দিয়ে মেঝেয় নামতেই তারা আমার দিকে ছুটে এল। আমি তাড়াতাড়ি আমার তলোয়ারটা বের করে একটার ঘাড়ে মারলাম সজোরে এক কোপ! অমনি সে পড়ে গেল সেখানে। আর একটি ইঁদুর তার সঙ্গীর ঐ অবস্থা দেখে ছুটে পালিয়ে গেল। কৃষক পত্নী ঘরে ঢুকে আমার বীরত্ব দেখে খুব তারিফ করল আমাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐ কৃষক পত্নীর একটি মেয়েও ছিল। তার বয়স বছর দশেক হবে। অতি অল্প বয়সের এমন গুণের মেয়ে আমি দেখি নি কোথাও। আমার জন্য তার দরদের অন্ত ছিল না।

মেয়েটি খুব ভাল শেলাই করতে জানত। আমাকে সে এর মধ্যেই আট-দশটা জামা তৈরী করে দিয়েছে! তার পুতুলের জন্য ছিল একটা ছোট্ট খাট। সেই খাটটা সে আমার জন্য ছেড়ে দিল। আমার বিছানার জন্য সে তার পুতুলের কাপড় কেটে—বালিস, চাদর আরও কত কি করল।

সে আমাকে ঐ দেশের ভাষাও শেখাতে লাগল। ছোট ছেলেদের মত আমি এটা কি, ওটা কি জিজ্ঞাসা করতাম আর সে তার উত্তর দিত। আমি আমার নোট বইতে লিখে রাখতাম কথাগুলো। এইভাবে অল্প দিনের মধ্যেই আমি অনেক কথা শিখে ফেললাম ঐ দেশের।

সে আমার নাম দিয়েছিল 'গ্রীলড্রিগ'। এই নামেই আমি তাদের পারিবারে এবং পরে সমগ্র ব্রবডিংনাগ রাজ্যে পরিচিত হ'য়েছিলাম।

আমি যতদিন ওখানে ছিলাম, কখনও তার কাছ-ছাড়া হইনি। আমি তাকে 'গ্লামড্যালক্লিচ' বলে ডাকতাম। আমার ভ্রমণ-কথা

বলতে গিয়ে এই মেয়েটির কথা না বললে অকৃতজ্ঞতার পাপ হবে। বাস্তবিক এই মেয়েটির কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী। সে আমাকে যে ভাবে যত্ন করেছে তা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না।

ক্রমে ক্রমে আশেপাশের গ্রামে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল যে অমুক কৃষক একটি অদ্ভুত জন্তু ধরেছে। জন্তুটা দেখতে মানুষের মতই তবে একেবারে ক্ষুদে মানুষ। সব কাজই সে করতে পারে, নিজের ভাষায় কথা বলে এবং ঐ দেশের ভাষাও সে এর মধ্যে বেশ কিছু শিখে ফেলেছে। সে দুপায়ের উপর সোজা চলে, প্রাণীটি বেশ শান্ত ও ভদ্র। ডাকলে চলে আসে কাছে, যা বলা যায় তাই করে।

ঐ কৃষকের এক বন্ধু ছিল পাশের গাঁয়েই। সেও কৃষক। খবর শুনে সে জানতে এল ঘটনাটা সত্যি কিনা। অমনি আমাকে ডেকে আনা হ'ল। লোকটি তার চশমাটা বার কয়েক মুছে নিয়ে ভাল করে আমাকে দেখল। আমাকে যা করতে বলা হল আমি তা করলাম, যা জিজ্ঞাসা করল তার উত্তর দিলাম।

সে আমার রক্ষক ঐ কৃষককে পরামর্শ দিল, একে দেখিয়ে দু'পয়সা আয় করে নাও। হাটবারে একে নিয়ে যাও, দেখবে বেশ কিছু রোজগার করে আনতে পারবে।

ফিস ফিস্ করে সে আরও কত কি সব বলল, আমাকে মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে দেখাল। তাদের কোন কোন কথা আমি বুঝতেও পারলাম।

কিন্তু পরদিন গ্লামড্যালক্লিচ আমাকে সব কথা খুলে বলল। সে কৌশল করে তার মায়ের কাছ থেকে ঐসব জানতে পেরেছে।



লোকটি তার চশমাটা বার কয়েক মুছে নিয়ে ভালো করে
আমাকে দেখল।

মেয়েটি আমার জন্য কেঁদে ফেলল। তার ভয় হ'ল কতকগুলি গেঁয়ো, আনাড়ীর হাতে পড়ে আমার দুর্গতির একশেষ হবে।

বন্ধুর কথা মত ঐ কৃষক আমাকে একটা বাক্সে করে হাটে নিয়ে চলল—আমাকে দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করবে বলে। সঙ্গে নিল তার মেয়েকে। পথের কষ্ট যাতে আমার কম হয় সেজন্য ঐ মেয়েটি বাক্সের মধ্যে বেশ পুরু করে বিছানা পেতে দিল। কিন্তু বিছানা পুরু হলে কি হবে, ঝাঁকানীতে আমার পেটের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়েছিল সেদিন। ঘোড়াটি এক একটি পদক্ষেপে চলছিল, প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ হাত। সে যখন উঁচুতে লাফ দিচ্ছিল তখন মনে হ'চ্ছিল ভীষণ ঝড়ে সমুদ্রের ঢেউ যেন উঠছে আর নামছে! যাহ'ক আমরা গিয়ে একটা হোটেলে উঠলাম। আমার সম্বন্ধে কত কিছু লিখে বিজ্ঞাপন ছাড়া হ'ল চতুর্দিকে।

যে বড় ঘরটায় আমাকে দেখানো হবে, সেখানে একখানি টেবিল পেতে আমাকে রাখা হ'ল তার উপর। আমার রক্ষক 'গ্লামড্যালক্লিচ' ঐ টেবিলের পাশেই একখানা টুল নিয়ে বসল। তার উপরই আমার তদারকের ভার এবং আমায় কি করতে হবে না হবে সে-ই তা বলে দিচ্ছিল। ভীড় সামলাবার জন্য ঠিক হল, এক এক বারে ত্রিশজন করে আমাকে দেখতে আসবে। বালিকাটির নির্দেশ মত আমি টেবিলের উপর একবার ঘুরে আসলাম। ওদের দেশের ভাষা আমি কতখানি শিখেছি তা ঐ মেয়েটি বেশ ভালোই জানত। সেই অনুসারে সে আমাকে এমন সব প্রশ্ন করত যার উত্তর ওদের ভাষায় স্পষ্ট করে আমি বলতে পারি। আমি তাদের অভিবাদন করতাম, আমার তরবারি খুলে ওদের

খেলা দেখাতাম আবার খাপের মধ্যে তরবারিটা পুরে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতাম। সে দিন আমাকে বারো-চৌদ্দ বার ওই একই জিনিস দেখাতে হ'য়েছিল। এর পর আমি একেবারে আধমরা হ'য়ে পড়লাম। যে সব লোক আমার কার্যকলাপ দেখে গেল, তারা বাইরে গিয়ে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক কিছু বাড়িয়ে বলেছিল। তার ফলে লোক ভেঙ্গে পড়ল এসে আমাকে দেখবার জন্য। কেউ যাতে আমার গায়ে হাত দিতে না পারে তার ব্যবস্থা আগেই করা ছিল; তবু একটা বদমায়েস ছেলে এমন একটা ঢিল ছুড়ে দিল যে, ওটা আমার মাথায় লাগলে আর রক্ষা ছিল না।

কৃষক আমাকে তার বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। প্রায় দিন তিনেক লাগল আমার সুস্থ হ'তে। কিন্তু এখানেও কি আমার নিষ্কৃতি ছিল—আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল আমাকে দেখতে। আমাদের দেশে যেমন রবিবার, ওদের দেশে তেমনি বুধবারটা হ'চ্ছে ছুটির দিন। এই ছুটির দিনটি আর সব কটা দিনই আমাকে দেখবার জন্য লোকের ভীড় হ'তে লাগল! কৃষকও আমাকে দিয়ে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করে নিল।

ব্যবসাটা বিশেষ লাভজনক দেখে, কৃষক স্থির করল, ঐ রাজ্যের বড় বড় শহরগুলিতে নিয়ে আমাকে দেখাবে। আমি এখানে আসবার মাস দুই পরেই কৃষক একদিন যোগাড়যন্ত্র করে আমাকে নিয়ে চলল, প্রায় তিন হাজার মাইল দূরে—রাজধানীতে। কৃষকের মেয়েটিও চলল আমাদের সঙ্গে। সেই-ই ছিল আমার একমাত্র আশা-ভরসা।

পথে যতগুলি বড় বড় জায়গা প'ড়েছে প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই আমাকে দেখানো হয়েছিল। মেয়েটি আমার শারীরিক কষ্টের কথা বুঝত, তাই সে মাঝে মাঝে নিজের অসুস্থতার ভাণ করে আমার বিশ্রাম আদায় করে নিত।

মাস কয়েক পরে আমরা উপস্থিত হলাম রাজধানীতে। এখানে আমার সম্বন্ধে দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। একটা মস্ত বড় হলঘর ভাড়া করল ঐ কৃষক। দৈনিক দশবার করে 'শো' চলত। এই সময়ে আমি ঐ দেশের অনেক কথাই বলতে শিখেছি এবং প্রায় সকলের কথাই বুঝতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়

কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত পরিশ্রম করায় আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আমার ক্ষুধামান্দ্য হল এবং দেহ হ'য়ে গেল কঙ্কালসার। আমার প্রভু কৃষকটি তা লক্ষ্য ক'রে যত তাড়াতাড়ি হয় আমাকে দিয়ে কিছু লাভ করে নেওয়ার মতলব করল। কারণ, সে জানত, আমি আর বেশী দিন বাঁচব না।

ঠিক এমনি সময়ে রাজবাড়ী থেকে একজন লোক খবর নিয়ে এল, রানী এবং তাঁর সঙ্গীনীরা আমাকে দেখতে চান।

তখনই আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল রানীর কাছে। আমি সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণিপাত করে বিনীতভাবে হাত জোড় করে দাঁড়ালাম। রানী আমাকে আমার দেশ ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি পরিষ্কার ভাবে এবং সংক্ষেপে তার উত্তর দিলাম। রাজবাড়ীতে আমি থাকতে চাই কিনা রানী জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আবার প্রণিপাত করে সবিনয়ে বললাম, আমি আমার প্রভুর ক্রীতদাস কিন্তু আমি যদি তা না হতাম, তাহলে মহারানীর সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তা শুনে রানী ঐ কৃষককে বললেন, সে বেশ ভাল দাম পেলে আমাকে বিক্রয় করতে রাজী কি না।

কৃষকের কাছে এটা একটা স্ুবর্ণ সুযোগ। কারণ সে জানত, মাসখানেকের বেশি আমি আর বাঁচব না! সে একটা মোটা টাকা দাম চেয়ে বসল আমার জন্য। রানী তৎক্ষণাৎ সেই হাজার খানেক গিনি দিয়ে আমাকে কিনে নিলেন।

আমি তখন রানীর কাছে বিনীত অনুরোধ জানালাম, গ্লামড্যালক্লিচকেও তিনি একটা চাকরি দিয়ে এখানে রেখে দিন। সে-ই আমার দেখাশুনা করে খুব যত্ন করে—এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমি দেখি নি। রানী তাকে তাঁর কাজে নিযুক্ত করলেন। কৃষক এতে খুব খুসীই হ'ল—একটা চাষীর মেয়ের রাজবাড়ীতে চাকরি পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়! গ্লামড্যালক্লিচেরও আনন্দ আর ধরে না—যখন সে জানতে পারল, আমারই তত্ত্বাবধানের জন্য সে রাজবাড়ীতে থাকতে পাবে।

আমার প্রভু কৃষক চলে যাওয়ার সময় বলল, তোমাকে ত' ভালো জায়গাতেই রেখে গেলাম বাপু। আমি তার উত্তরে কোন কথা না বলে শুধু একটা নমস্কার করে তাকে বিদায় দিলাম।

রানী ওটা লক্ষ্য করলেন। কৃষক চলে যাওয়ার পর তিনি আমাকে সব জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আর আমার ভয় কি? আমি নির্ভয়ে তাঁকে জানালাম, ঐ কৃষক আমাকে তার ক্ষেতের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়ে এক আছাড়ে আমার মাথাটা যে গুঁড়ো করে দেয় নি—এই জন্যই মাত্র আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। সেজন্য সে মূল্যও

পেয়েছে কম নয়। সমগ্র রাজ্যে সে আমাকে দেখিয়ে টাকা কম পায় নি—তার উপর বিক্রয়ের এই এতগুলি টাকা! অতিরিক্ত খাটুনীতে আমার দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে। আমার বাঁচবার আশা নেই না জানলে হয়ত সে বিক্রয়ও করত না আমাকে। ভগবানের আশীর্বাদে মহারানীর আশ্রয় নিয়ে আমি আবার নতুন প্রাণ পেলাম।

ঐ দেশের ভাষায় আমার কথা বলার মধ্যে কিছু গলদ থাকলেও রানী আমার মত এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণীর এত বুদ্ধি ও সৌজন্যবোধ দেখে মুগ্ধ হলেন। আমাকে হাতের উপর করে নিয়ে তিনি রাজার কাছে গেলেন।

রাজা আমাকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন, আমি কলকব্জা দিয়ে তৈরি একটা পুতুল বোধ হয়। কিন্তু যখন আমার কথাবার্তা শুনলেন, তখন তিনি অবাক হ'য়ে গেলেন।

আমার সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা করবার জন্য রাজা তাঁর বড় বড় তিন জন পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আমাকে ভাল করে দেখলেন কিন্তু মন্তব্যের বেলায় তিনজন একমত হ'তে পারলেন না। তবে সকলেই এ কথা বললেন যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আমার জন্ম নয়। কারণ, আমার দেহে বেঁচে থাকবার মত শক্তি নেই—জোরে ছুটতে পারা, গাছে চড়া বা গর্ত করার ক্ষমতাও আমার নেই। তাঁরা আমার দাঁত দেখে বললেন, আমি মাংসাশী প্রাণী। কিন্তু শামুক প্রভৃতি না খেয়ে আমি বেঁচে আছি কি করে তাই ভেবে তাঁরা অবাক হলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ আবার বললেন, আমি

অপূর্ণ অবস্থায় জন্মেছি। কিন্তু এই মন্তব্য আবার খণ্ডন করলেন আর এক পণ্ডিত এই ব'লে যে, আমার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অসম্পূর্ণ নয় এবং আমার বেশ কিছু বয়সও হয়েছে। তাঁরা আমাকে বামন বলেও মানতে রাজী হ'লেন না ; কারণ, রানীর যে একজন বামন ছিল সেও লম্বায় প্রায় ত্রিশ ফুট হবে—আমার মত এত ক্ষুদ্র প্রাণীকে বামন বলা চলে না। তাদের মতে আমি একটা অদ্ভুত জীব—প্রকৃতির একটা খেয়াল !

চতুর্থ অধ্যায়

পাঠককে এই দেশের একটা বিবরণ দিতে চাই এখন। রাজধানীর চতুর্দিকে প্রায় দু'হাজার মাইল পর্যন্ত আমি ঘুরেছিলাম। রানীর সঙ্গে আমি সর্বদাই বেড়াতে যেতাম। তিনি এর বেশি যান নি। সম্রাটের সঙ্গে গেলেও তিনি এই দু' হাজার মাইল পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতেন—সম্রাট তাঁর সীমান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসতেন। রাজ্যটি দৈর্ঘ্যে ছিল ছ' হাজার মাইল এবং প্রস্থে ছিল প্রায় চার-পাঁচ হাজার মাইল। আমি এখানে মন্তব্য না করে পাচ্ছি না যে, আমাদের ইউরোপের ভৌগোলিকগণ জাপান ও ক্যালিফোর-নিয়ার মাঝে সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই মনে করে মস্ত বড় ভুল করেছেন। তাঁদের উচিত এই বিরাট দেশটিকে আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে সংযুক্ত করে ম্যাপের ভ্রম সংশোধন করা—এজন্য আমি তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

এই রাজ্যটির উত্তর পশ্চিমে ত্রিশ মাইল উচ্চ একটি পর্বতমালা বর্তমান। পাহাড়গুলির চূড়ায় রয়েছে আগ্নেয়গিরি। সেজন্য এই পর্বতমালা একেবারেই দুর্লঙ্ঘ্য। রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিতেরাও জানেন না. এই পাহাড়ের ওপারে কি রকম মানুষ বাস করে অথবা আদপে বাস করে কি না। এর আর তিন দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। সমস্ত রাজ্যটিতে একটিও বন্দর নেই। এই রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সমুদ্র সূঁচালো শীর্ণ পাহাড়ে পূর্ণ, তাছাড়া এখানকার সমুদ্র এতই

ঝড়ঝঞ্ঝাময় যে, সেখানে কেউ যেতেই সাহস পায় না। সেই জন্য এই দেশের লোক আর আর দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই দেশের মধ্যে যে নদীটি আছে তাতে কিন্তু প্রচুর নৌকা ও জাহাজ আছে। দেশের লোক এই নদীর মাছ খায়। সমুদ্রে যদিও মাছ আছে কিন্তু সেগুলি আমাদের দেশের মতই মাছ এবং সেগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে করে এখানকার লোকেরা খায় না। নদীর মাছ কিন্তু এখানকার মানুষ, গাছপালা ও জীবজন্তুর মতই অতিকায়।

এই দেশের বসতিও বেশ ঘন। এখানে একান্নটি শহর এবং বহু পল্লী বর্তমান। যে নদীটি দেশের ভিতর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে তার উভয় তীরে রাজধানী। প্রায় আশি হাজার বাড়ী আছে এবং লোকও আছে প্রায় ষাট লক্ষ। শহরটির দৈর্ঘ্য প্রায় চুয়ান্ন মাইল এবং চওড়া চল্লিশ মাইল।

সম্রাটের বাস-ভবনটি প্রায় সাত মাইল ঘুরানো। এর মধ্যে আছে অসংখ্য বাড়ী। প্রধান ঘরগুলি প্রায় দুশো চল্লিশ মাইল উঁচু এবং সেগুলি লম্বা-চওড়াও এই অনুসারে। রানী যে গাড়ীতে করে বেড়াতে বা কোন কিছু কিনতে দোকানে যেতেন, আমিও ঐ গাড়ীতে কৃষক-কন্যার তত্ত্বাবধানে যেতাম। সে প্রায়ই আমকে খোলা দরজার কাছে ধরে বসে থাকত -যাতে আমি চারিদিক ভাল করে দেখতে পাই এবং যে সব লোক আমাকে দেখবার জন্য ভীড় করে তারাও সহজে আমাকে দেখতে পারে।

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মন্দিরটি দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। সঙ্গে ছিল আমার নার্স—সেই কৃষক কন্যা। কিন্তু মন্দিরটি

দেখে আমি ভগ্ন-মনোরথ হ'য়েছিলাম বললে ভুল হবে না। কারণ ওর উচ্চতা তিন হাজার ফুটের বেশি নয়। ও দেশের বিরাটত্বের তুলনায় ওটা এমন কিছু নয়। তবে ওর শিল্পকাজ যথেষ্ট প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। দেওয়ালগুলি প্রায় একশো ফুট পুরু। মন্দিরে দেবতা ও রাজাদের মার্বেল পাথরে তৈরি মূর্তি রক্ষিত আছে।

সম্রাটের আস্তাবলে প্রায় ছশো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াগুলি পঞ্চাশ ষাট ফুট উঁচু। কোনও বিশিষ্ট পর্বদিনে সম্রাটের বেরোবার সময় পাঁচশো ঘোড়সোয়ার তাঁর দেহরক্ষী হয়ে যেত। সেটা একটা দেখবার মত জিনিস।

পঞ্চম অধ্যায়

ঐ দেশে আমার দিনগুলো বেশ সুখেই কাটত যদি না আমার এই ক্ষুদ্রত্বের জন্যে কতকগুলি হাস্যকর ঘটনা ও দুর্ঘটনা না ঘটত। আমি তার কয়েকটির উল্লেখ কচ্ছি এখানে ঃ গ্লামড্যালক্লিচ প্রায়ই আমাকে নিয়ে সম্রাটের উদ্যানে বেড়াতে যেত। ঘেরা বাগানে আমি স্বাধীন ভাবেই ঘুরে বেড়াতাম। সেই বামন লোকটি অনেকদিন পরে এসে উদয় হল। আমাদের পেছন পেছন সেও এল বাগানে। আমি একটা আপেল গাছের কাছে গিয়েছি তখন দেখি বামনটাও গিয়েছে সেখানে। আমাদের দেশে যেমন—'বামন হ'য়ে চাঁদে হাত' একটা কথা আছে, ও দেশেও তেমনি আপেল আর বামন সম্বন্ধে একটা ব্যঙ্গ প্রবাদ আছে। বামনকে আপেল তলায় দেখে আমি বলে ফেললাম, সে কথাটা। শয়তানটা সুযোগ বুঝে গাছটাকে এমন একটা ঝাঁকুনী দিল যে ডজন খানেক আপেল দুড় দাড় পড়ে গেল গাছ থেকে। আপেল ত' নয়—যেন এক একটা বড় কুমড়ো! কোনোটা আমার মাথায় পড়ল, কোনোটা পড়ল ঘাড়ে। আমি উপুড় হ'য়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। যা'ক মারাত্মক আঘাত আমার লাগেনি সেদিন, তা ছাড়া আমিই তাকে উত্তেজিত করেছিলাম মনে করে সে যাত্রা তাকে ক্ষমা করা হল।

আর একবার ঘুরে বেড়াচ্ছি বাগানে এমন সময় আরম্ভ হল শিলাবৃষ্টি। ওদেশের শিলাগুলিও কী বড়! এক একটা শিলা যেন এক একটা ফুটবল!—আমি ছুটতে ছুটতে একটা আশ্রয় নিলাম তাতেই আমার মাথাটা বাঁচল কিন্তু সমস্ত গায়ে আমার এমন কালশিরে পড়ে গিয়েছিল যে দশদিন আমি ঘরের বাইরে যেতে পারিনি।

কিন্তু ঐ বাগানেই এর চেয়েও বড় বিপদে পড়েছিলাম একদিন। আমি একা একা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় একটা স্পেনিয়েল কুকুর আমার গন্ধ পেয়ে সোজা ছুটে এল এবং আমাকে মুখে করে নিয়ে উপস্থিত হ'ল তার প্রভুর কাছে! তারপর আস্তে রেখে দিল আমাকে মাটিতে। সৌভাগ্যক্রমে কুকুরটা ছিল সুশিক্ষিত। সে আমাকে এমনভাবে কামড়ে ধরে নিয়ে গেল যে আমি একটুও ব্যথা পেলাম না বা আমার জামাকাপড়ও ছিড়ল না। ঐ কুকুরের প্রভু আমাকে বিলক্ষণ চিনত। সে খুব যত্ন করে আমাকে তুলে নিল আর জিজ্ঞাসা করল আমার লেগেছে কিনা; কিন্তু আমি তখন এমনই হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছি যে আমার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরুল না। কিছুক্ষণ পরে আমি সুস্থ হলাম। আমার নার্স—কৃষক কন্যা ব্যস্ত হ'য়ে আমায় খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হল। কিন্তু ভয়ে এ খবর আর কেউই প্রকাশ করেনি।

খুনী আসামীর প্রাণদণ্ড দেখাটা খুব আরামের নয়। তবু এদেশের প্রাণদণ্ড কি ভাবে দেওয়া হয় দেখবার জন্য গিয়েছিলাম বধ্যভূমিতে একদিন। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। লোকটিকে

চেয়ারের উপর বসিয়ে প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাত লম্বা একখানি ধারালো তরবারি দিয়ে তার মাথাটা কাটা হ'ল! রক্তের গঙ্গা বয়ে গেল সেখানে। সে দৃশ্য দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম সেদিন।

রানীর কাছে প্রায়ই আমি আমার সমুদ্রযাত্রার গল্প বলতাম। রানী আমাকে একখানা নৌকা করে দিতে চাইলেন। সেই জন্য আমার নির্দেশ অনুসারে মিস্ত্রী কাঠ দিয়ে একখানা নৌকা তৈরি করল। একটা মস্ত বড় ঘরের মেঝেয় তিনশো ফুট লম্বা, পঞ্চাশ ফুট চওড়া এবং আট ফুট গভীর একটা কাঠের চৌবাচ্চায় জল ধরে রাখা হ'ত। ওর মধ্যে আমি আমার নৌকা চালাতাম। মাঝে মাঝে আমি পাল খাটিয়েও হাল ধরে বসে থাকতাম। রানী ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের পাখা দিয়ে বা কেউ কেউ ফুঁ দিয়ে এই পাল চালিয়ে দিতেন!

একবার কি ভাবে একটা ব্যাং পড়েছিল ঐ চৌবাচ্চার মধ্যে। সে আমার নৌকার একদিক দিয়ে উঠতে গিয়ে নৌকাটি ডুবিয়ে ফেলে আর কি! অবশেষে নৌকার বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে ব্যাংটিকে নামতে বাধ্য করি।

কিন্তু সব চাইতে বড় বিপদ ঘটেছিল আমার একটা বানর থেকে। গ্লামড্যালক্লিচ বাইরে যাওয়ার সময় আমার ঘরে তালা মেরে রেখে যেত। একদিন বেশ গরম পড়েছিল। তাই সে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমার ঘরের জানালা-দরজা খুলে রেখে গেল।



একটা কাঠের চৌবাচ্চায় জল ধরে রাখা হ'ত। ওর মধ্যে আমি আমার নৌকা চালাতাম।

আমি টেবিলে বসে আমার অতীত আর ভবিষ্যতের কথা ভাবছি, এমন সময় মনে হল, জানালা দিয়ে কে যেন মাথা বাড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ঘরের চারদিকে কিচির-মিচির শব্দও শোনা গেল। দেখলাম একটি বানর আমার ঘরের মধ্যে আসবার জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। আমাকে দেখতে না পায় এই ভাবে আমি ঘরের এক কোণে গিয়ে লুকোলাম

কিছুক্ষণ পরেই সে ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর বিড়াল ইঁদুরকে ধরবার সময় ইঁদুরটি যেমন ছুটাছুটি করে, আমিও তেমনি ঘরের একবার একোণ একবার সে-কোণ পালাতে লাগলাম। অবশেষে বানরটি আমার কোটের কলারটা টেনে ধরল। তারপরই তার ডান হাত দিয়ে বাচ্চাকে যে ভাবে নিয়ে যায় ঐ ভাবে আমাকে বুকে চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তার কাছ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমি যত ছটফট করতে লাগলাম, সে ততই আমাকে জোরে জাপটে ধরল। বুঝলাম মুক্তিলাভের চেষ্টা বৃথা। সে যে ভাবে মাঝে মাঝে আদর করে আমার মাথা চাপড়াতে লাগল, তাতে পরিষ্কার বুঝলাম সে আমাকে বানরের বাচ্চা মনে করেছে।

তারপর একটা হৈ চৈ শব্দ শুনে সে তিন লাফে আমাকে নিয়ে উঠল গিয়ে উঁচু ছাতে। আমি গ্লামড্যালক্লিচের ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেলাম। চাকরেরা মই নিয়ে ছুটে এল। দেখতে দেখতে প্রায় শ'খানেক লোক নীচে দাঁড়িয়ে সভয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। কেউ কেউ ঢিল ছুড়তে লাগল ঐ বানর-

টাকে—কিন্তু তখনই কড়া নিষেধ করা হল ঢিল ছুড়তে। ভালই হল, নতুবা ঐ ঢিলের ঘায়েই হয়ত আমার ভবলীলা সাঙ্গ হত। ইতিমধ্যে কতকগুলি লোক মইয়ের সাহায্যে উঠে পড়ল ছাদে। বানরটি নিজেকে বিপন্ন মনে করে আমাকে একটা আলসের উপর নামিয়ে রেখে চম্পট দিল। তিনশো ফুট উপরে এই আলসের উপর আমি বসে রইলাম কিছুক্ষণ। আমার গা বমি বমি কচ্ছিল তখন এবং প্রতি মুহূর্তে মনে হ'চ্ছিল, ওখান থেকে পড়ে গিয়ে আমার হাড়গোড় চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

ইতিমধ্যে একটা চটপটে ছোকরা কি ভাবে উঠে পড়ল সেখানে এবং তাড়াতাড়ি আমাকে ধরে নিয়ে তার পকেটে পুরে নেমে এল।

এর ফলে আমি প্রায় পনবদিন বিছানায় পড়ে থাকলাম। এই সময়ে রানী নিজে কয়েকবার এসে আমাকে দেখে গেলেন। সম্রাট এবং তাঁর অমাত্যগণও আমার খোঁজখবর নিতেন রোজই। সেরে উঠে যখন আমি রাজাকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম—বানরটি যখন আমাকে নিয়ে উপরে উঠে গেল. তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হ'য়েছিল—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরও বললেন, ঠিক এই অবস্থা আমার দেশে ঘটলে আমি কি করতাম ?

সম্রাটকে আমি বললাম, সখ করে বা খেলা দেখাবার জন্য দু'চারটে বানর যা বিদেশ থেকে আনা হয়, তাছাড়া ইউরোপে কোন বানর নেই। তাছাড়া সেগুলি এতই ছোট যে, দু'চারটেকে ঠেঙ্গিয়েই তাড়ান যায়। বৃহদাকার বানরটি যখন আমায় ধরল. তখন আমার এই কথাই মনে হ'য়েছিল, যদি আমার তরবারিটা

হাতের কাছে পেতাম তাহলে বাছাধনকে দেখিয়ে দিতাম আমাকে ধরার মজাটা।

কথাগুলি আমি বেশ বীরত্বের সঙ্গেই বলেছিলাম। কিন্তু তা শুনে সম্রাট ও তার পারিষদেরা খানিকটা অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন মাত্র। বুঝলাম, ক্ষুদ্র আর বৃহতে যেখানে এতখানি তফাৎ, সেখানে কিছু বলতে যাওয়াই ভুল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্রাটকে নাপিত সপ্তাহে দু'বার করে কামিয়ে দিয়ে যেত। তার হাতের ক্ষুরখানা দেখে সত্যিই আমি ভয় পেতাম। ক্ষুর ত' নয়—যেন একখানা খাঁড়া; আমার চিরুনিখানা গিয়েছিল নষ্ট হ'য়ে। এই সময়ে আমি একখানা ছোট চিরুনি তৈরি করলাম কাঠ কেটে। আর একটা জিনিসও করেছিলাম। রানীর মাথার চুল আঁচড়াবার পর যে চুলগুলি উঠে আসত, ঐগুলি আমি চেয়ে নিতাম। তারপর ঐ চুল দিয়ে তৈরি করলাম একখানি বসবার চেয়ার। ওটা আমি রানীকে উপহার দিয়েছিলাম। খুব খুশী হ'য়েছিলেন তিনি ওটা পেয়ে। একদিন তার ঘরে গেলে তিনি ঐ চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন। আমি সবিনয়ে জানালাম, প্রাণ গেলেও সে আমি পারব না। যে চুল স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর মাথার শোভা বর্ধন করত সেই চুলের উপর আমি বসতে পারি কখনও?

তাঁর চুল দিয়ে আমি পাঁচ-ছ' ফুট লম্বা একটা বুনানী দেওয়া থলেও তৈরি করে দিয়েছিলাম গ্লামড্যালক্লিচকে।

রাজা সঙ্গীত ভালবাসতেন খুব। এজন্য তাঁর বাড়ীতেই মাঝে মাঝে কনসার্ট পার্টি বসত। আমাকেও রাজা ডাকিয়ে বসাতেন সেখানে। ওদের গলার আওয়াজ যেমন, সঙ্গীতের উচ্চনাদও তেমনি; ওরা যখন কনসার্ট বাজাতো, আমার মনে হ'ত—একদল যুদ্ধের সৈন্য ঢাক পিটাচ্ছে; আমার কান ঝালাপালা হ'য়ে যেত। আমি আমার চেয়ারটা নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে বসতাম!

একটা যন্ত্র তৈরি করলাম আমি নিজে বাজাবার জন্য। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে সেই যন্ত্র বাজিয়ে শোনালাম। তাঁরা খুব খুশী হলেন সেই বাজনা শুনে।

সম্রাট মধ্যে মধ্যে আমাকে তাঁর সম্মুখে এনে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। একদিন তাঁকে আমি সাহস করে বলেই ফেললাম, সম্রাট যেমন বুদ্ধিমান ও গুণগ্রাহী তাতে আপনার উচিত নয়, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধমত পোষণ করা। দেহের আয়তন বৃহৎ হ'লেই যে বুদ্ধির আয়তন বৃহৎ হবে তা তো নয়: বরং আমাদের দেশে তার উল্টোটাই দেখতে পাই। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌমাছি ও পিঁপড়ের খুব বেশি বুদ্ধি। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, কলাকুশলী ও কর্তব্যনিষ্ঠ। অন্য বড় প্রাণী কিন্তু তেমন নয়।

সম্রাট আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ইংল্যাণ্ডের সরকার সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ জানতে চাইলেন। তখন আমার মনে হল, ডেমোস্থিনিস বা সিসারোর মত বাগ্মিতা যদি থাকত আমার, তাহ'লে আমার দেশের গুণগান যথাযথরূপে বর্ণনা করতে পারতাম।

আমার দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, উর্বরা শক্তি এবং জলবায়ুর সম্বন্ধে অনেক কথাই বললাম সম্রাটকে। তারপর ইংল্যাণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের কথা, হাউস অব কমনস্-এর কথাও সব বললাম। বিচারালয়, জজ, ন্যায়, অন্যায়, বিচার, ধনসম্পদ রক্ষার ব্যবস্থার কথাও একে একে সম্রাটকে বলা হল। ট্রেজারী, স্থল ও জলের

সৈন্যবাহিনীর কথা, ধর্মমতের কথা, খেলাধুলার কথা তারপর এক এক ক'রে বলে গেলাম।

সম্রাট সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। মাঝে মাঝে তিনি আমার কথা টুকে নিলেন তাঁর নোট বইয়ে।

এরপর সম্রাট প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমাকে। সেইসব প্রশ্নে আমাদের দেশের সমস্ত ত্রুটি এবং সম্রাটের জ্ঞান ও দূরদর্শিতার কথা ফুটে উঠল।

তাঁদের এই স্থির মন্তব্যের পর আমি আমার দু' একটা কথা শুনবার জন্য অনুরোধ করলাম। সম্রাটকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম, আমি এমন একটি দেশ থেকে এসেছি যেখানে আমার মত আকারের লক্ষ লক্ষ মেয়ে, পুরুষ বাস করে। সেখানকার গাছপালা, প্রাণী এবং ঘরবাড়ী প্রভৃতি সকল কিছুরই বেশ সামঞ্জস্য আছে। এখানকার লোকেরা যেমন আত্মরক্ষা করতে বা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, সেখানকার লোকেরাও তেমনি পারে। এগুলি হ'ল ঐ সব পণ্ডিতের মন্তব্যেরই উত্তর। কিন্তু ওরা আমার কথা বিশ্বাস করল না—ভাবল, এসব আমার ঐ কৃষকের শিখানো বুলি। সম্রাটের কিন্তু বুঝবার ক্ষমতা বেশিই ছিল; তিনি পণ্ডিতদের বিদায় দিয়ে সেই কৃষক আর তার মেয়েকে ডাকিয়ে সব কথা শুনলেন এবং ভাবলেন, হয়ত আমার কথাই সত্যি। তখন থেকে রাজা আমার প্রতি বিশেষ যত্নশীল হ'লেন। কৃষককন্যা আমার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হ'ল—আমার জন্য আলাদা কাঠের ঘর তৈরি হল।

রানীরও আমি এত প্রিয় হলাম যে, আমাকে ছাড়া তাঁর খাওয়াই হত না। রানীর টেবিলের পাশেই রাখা হত আমার খাওয়ার টেবিল। রানীর ক্ষুধামান্দ্য ছিল। তবু খাওয়ার যে বহর তাঁর দেখেছি তাতেই আমার চক্ষুস্থির।

প্রতি বুধবারে ওদের রাজপরিবারের সকলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। আমিও সেখানে বসতাম। সম্রাট আমার দেশের আচার-ব্যবহার, ধর্ম, রাজনীতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। আমিও যতদূর ভালোভাবে বলা যায় তা বলতাম। কিন্তু আমি যখন ভাবাবেগে আমার দেশের ব্যবসা, জল ও স্থলের যুদ্ধ, দেশের বিভিন্ন দল প্রভৃতির কথা বলতাম তখন সম্রাট আমার মাথাটা চাপড়ে দিয়ে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি কোন্ দলের—হুইগ না টোরী? তারপর তিনি তাঁর বৃদ্ধ মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলতেন, এই ছোট্ট প্রাণীদের আবার উপাধি! ওদের বাড়ী ঘরদোর আর শহর! ওদের মধ্যেও আবার ঝগড়া, মারামারি, যুদ্ধ,ভালবাসা এবং প্রতারণা! অ্যা; কথাগুলি তিনি এমন অবজ্ঞাভরেই বলতেন যে আমি মাঝে মাঝে আমার দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি যা জগতের ঈর্ষার বস্তু তাকে এমন অপদস্ত করা হ'চ্ছে দেখে মনে মনে রেগে যেতাম।

প্রথম প্রথম আমার ঐ দেশের লোকদের অত্যন্ত বেখাপ্পা রকম বৃহৎ মনে হত; কিন্তু কিছুদিন ওখানে থাকবার পর বেশ বুঝতে পারলাম, ওরাও আমাদের মতই গাছপালা-পশুপক্ষীর সঙ্গে বেশ খাপ খায়। এরপর রানী যখন আমাকে তাঁর হাতের তালুর উপর দাঁড় করিয়ে আয়নার কাছে এসে দাঁড়াতেন, তখন তুজনের চেহারার এত

তফাৎ দেখে সত্যিই আমার হাসি পেত আর নিজের সম্বন্ধে ভাবতাম—আমি এত ক্ষুদ্র !

আগেই বলেছি, রানীর একটা 'বামন' বা বেঁটে লোক ছিল। এই লোকটিই ছিল আমার চক্ষুশূল। সে আমাকে ক্ষুদ্র বলে এত নিকৃষ্ট মনে করত যে, যখন তখন আমাকে ঠাট্টা করত। এর উত্তরে আমি তাকে আমার সঙ্গে কুস্তী লড়বার জন্য আহ্বান জানাতাম। একদিন খাবার সময় এই শয়তানটা আমার কোন একটা কথায় চটে গিয়ে আমাকে ফেলে দিল একটা মাখনের জালার মধ্যে। তারপর সে দিল চম্পট। আমি ডুবে গেলাম সেই মাখনের চৌবাচ্চায়। যদি আমি ভাল সাঁতার না জানতাম, তাহলে সেদিন আমি নির্ঘাত ডুবে মরতাম। গ্লামড্যালক্লিচ তখন ঘরের অপর প্রান্তে ছিল। রানী এই ব্যাপারে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে কিছুক্ষণ তিনি হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়লেন। দূর থেকে অবস্থাটা দেখতে পেয়ে কৃষক কন্যা ছুটে এসে আমাকে টেনে তুলল সেই চৌবাচ্চা থেকে। আমি অনেকখানি মাখন খেয়ে উঠলাম। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল—অবশ্য আমার জামাকাপড় নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি সেদিন হয়নি। ঐ বামনটাকে সেদিন আচ্ছা করে চাবুক মারা হল, ঐ চৌবাচ্চার অনেকখানি মাখন তাকে জোর করে খাওয়ান হ'ল, তারপর তাকে সরিয়ে দেওয়া হল অন্য জায়গায়। এরপর তাকে আমি আর দেখতে পাইনি।

এর আগেও ঐ শয়তানটা আমাকে নাস্তানাবুদ করেছিল একবার। রানী খাওয়ার সময় তার মাংসের একখানা বড় হাড়ের

মজ্জাটা খেয়ে ফাঁপা হাড়খানা রেখেছিলেন প্লেটের উপর খাড়া করে। ঐ বামনটা কৃষক-কন্যা কাছে নেই দেখে চট্ করে আমাকে ধরে ঢুকিয়ে দিল ঐ হাড়ের ফোকরের মধ্যে। আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাই আর কি! সেখান থেকে চিৎকার করাও আমার আত্মমর্যাদায় বাঁধল। ভাগ্যিস ওরা গরম মাংস প্রায়ই খায় না—তাহ'লে আমি ত' ঝলসে যেতাম সেই হাড়ের মধ্যে। অনেক কষ্টে বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু আমার জামাকাপড়ের দফা-রফা!

সেবারও ঐ বামনটাকে বেশ দু'চার ঘা চাবুক মারা হ'য়েছিল।

আমার ভীতু ভাব দেখে রানী প্রায়ই আমাকে বকতেন। জিজ্ঞাসা করতেন, আমার দেশের সব লোকই এই রকম ভীরু কি না! ঘটনাটা এই, গরম কালে এই দেশে মাছির বড় উৎপাত! আমার খাওয়ার সময় এই বিদঘুটে বৃহদাকার মাছিগুলো আমার কানের কাছে এসে অবিরত ভন্ ভন্ করত। কখনও তারা আমার নাকে কি কপালে ব'সে হুল ফুটিয়ে দিত। তাদের কামড়ে অসম্ভব যন্ত্রণা। দুর্গন্ধও বেরত খুব। এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাকে ছুটাছুটি করতে হত। মুখের উপর কোনও মাছি উড়ে এসে পড়লে আমি আঁৎকে উঠতাম। আমাদের দেশের ইস্কুলের ছেলেরা যেমন করে, তেমনিভাবে ঐ বামনটা তার মুঠোর মধ্যে কতকগুলো মাছি ধরে খামাখা আমার নাকের কাছে এনে ছেড়ে দিত!

মনে আছে একদিন সকালে জানালার ধারে বসে একখানা মিষ্টি কেক্ খাচ্ছি, অমনি গোটা কুড়ি বোলতা ওর গন্ধ পেয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে—কতকগুলো ব্যাগপাইপ বাজালে যেমন শব্দ হয় তেমনি শব্দ ক'রে। কয়েকটি বোলতা ঐ কেকের উপর পড়ল। বাকীগুলি আমার মাথার চারিদিকে এমন ভাবে ঘুরতে লাগলো যে কামড় খাওয়ার ভয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। আমার তলোয়ারটা দিয়ে গোটা কয়েককে ঘায়েল করলে আরগুলো পালালো। ওদের হুলটা ইঞ্চি দেড়েক লম্বা সূঁচের মত ধারালো।

———

সপ্তম অধ্যায়

আমার আখ্যানের এই অংশটা বাদ দিলে সত্যের অপলাপ করা হবে। আমার স্বদেশপ্রীতি ওদের কাছে হাস্যকর বলে মনে হ'য়েছে। এর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু সম্রাট সবিশেষ জানবার জন্য এতই আগ্রহশীল ছিলেন যে, তাঁকে তা না বলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয়, ভদ্রতাও নয়। তবু আমি কৌশল করে তাঁর অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছি এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশ বাড়িয়ে বলেছি। আমার দেশের দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন করে তার গুণ-গরিমার কথাই আমি বার বার বলতে চেয়েছি—যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এজন্য সম্রাটকেও দোষ দেওয়া চলে না; কারণ যিনি সমগ্র জগত থেকে বিচ্ছিন্ন তিনি অন্য দেশের রীতি-নীতি বুঝবেন কি করে? এই জ্ঞানের অভাবের জন্যই তাঁর সংস্কারের মধ্যে সংকীর্ণতা আসাই স্বাভাবিক।

ওদের দেশের সীমাবদ্ধ শিক্ষার একটা নমুনা দিচ্ছি। হয়ত এটা অনেকে বিশ্বাসই করবেন না।

সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি যাতে আমার উপর আসে এই উদ্দেশ্যে একদিন তাঁকে বললাম যে, আমাদের দেশে দু'তিনশো বছর আগে এক রকম গুড়ো দ্রব্য আবিষ্কৃত হ'য়েছিল যার গাদার মধ্যে এক

টুকরো আগুনের ফুলকি পড়লে নিমেষ মধ্যে সমস্ত জ্বলে উঠবে। ওটা শক্ত করে আঁটা থাকলেও একটু আগুনের ফুলকি ওটাকে বজ্রের মত শব্দ করে ফাটিয়ে দেবে। একটা লোহার নলের মধ্যে ঐ গুড়ো দিয়ে ওর মধ্যে লোহার বল রেখে আগুন দিলে ঐ বল এত জোরে ছুটে বেরিয়ে যাবে যে, কারও সাধ্য নেই তাকে ঠেকায়। ঐ বল যদি বড় হয় তাকে গোলা বলে। ঐ ভাবে গোলা ছুড়লে তাতে একটা বড় সেনার দল তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হতে পারে, বড় পাঁচিল ভাঙ্গতে পারে—হাজার হাজার লোক সহ জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে।

সম্রাটকে আরও বললাম, এই গুড়ো কি-কি দিয়ে তৈরি করতে হয় আমি জানি। জিনিসগুলি 'খুব সাধারণ' এবং তার দামও খুব বেশী নয়। কি ভাবে ওগুলি মিশাতে হয় তাও আমি জানি। লোহার নলগুলি কি-ভাবে তৈরি করতে হয় তাও আমি দেখিয়ে দিতে পারি। এই গুড়োর সাহায্যে সম্রাট তাঁর রাজ্যমধ্যে যে কোনও শক্ত প্রাচীর এক নিমেষে ভেঙ্গে ফেলতে পারবেন। সম্রাটের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ ও আশ্রয় আমি পেয়েছি তারই বিনিময়ে এই সামান্য একটা জিনিস অতি বিনীতভাবে তাঁকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

সম্রাট কিন্তু ঐ জিনিসের বর্ণনা শুনে ভয়েই অস্থির। আমার মত একটি দুর্বল কীট এরূপ নিষ্ঠুর ধারণা কি করে পোষণ করতে পারি তা তিনি ভেবে স্থির করতে পারলেন না! যে যন্ত্র সাহায্যে এরূপ রক্তাক্ত ধ্বংসলীলা ঘটতে পারে তা তৈরি করা কখনও সুবুদ্ধি-মানের কাজ নয়। আমাদের কতকগুলি শিল্পকলা আবিষ্কারের কথা

শুনে তিনি খুশী হ'য়েছিলেন সত্য কিন্তু নিজের জন্য তিনি ঐরূপ একটি ধ্বংসকারী যন্ত্র তৈরি করতে কখনই চান না। ও কথার উত্থাপন করতেও তিনি আমাকে নিষেধ করে দিলেন। তিনি বরং তার অর্ধেক রাজ্য হারাতে রাজী আছেন তবু এমন নিষ্ঠুর অমানুষিক যন্ত্র ব্যবহারের গোপন তথ্য জানতে চান না।

কোনও ইংরেজ পাঠক সম্রাটের এই রকম মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে ছোট মনে করবেন সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁরা রাজনীতির মধ্যে বিজ্ঞান ঢুকিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করেন নি। পর-রাজ্য বলে সেখানে কিছু ছিল না। রাজনীতির ঝগড়া অপেক্ষা জমিতে শস্য উৎপাদন করাটাই তারা বেশি প্রশংসার মনে করেন।

এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। নীতি শিক্ষা, ইতিহাস, কবিতা এবং গণিত তারা শেখেন ; কিন্তু কৃষি-কাজ এবং কল-কারখানার কাজও ঐ সঙ্গে তাদের শেখা উচিত।

ও দেশের আইনগুলি খুব সংক্ষিপ্ত ও সরল। কেউ ঐ আইন সম্বন্ধে সমালোচনা লিখলে সে দণ্ডনীয় হয়।

চীনাদের মত ছবির অক্ষরে ওদের বই ছাপা হয়। কিন্তু ওদের লাইব্রেরী বিশেষ বড় নয়। সম্রাটের যে লাইব্রেরীকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করে ওরা তাতে হাজার খানেকের বেশি বই নেই। বইগুলি অবশ্য আঠার থেকে কুড়ি ফুট লম্বা।

রাজার সৈন্য সংখ্যা একশো ছিয়াত্তর হাজার পদাতিক ও বত্রিশ হাজার অশ্বারোহী। সৈন্যেরা ব্যবসায়ী ও কৃষক।

আমার জানবার জন্য বড় আগ্রহ হ'ত—যে সম্রাটের রাজ্যে অন্য দেশ থেকে আসবার কোন উপায় ছিল না, সেখানে তারা সৈন্যের

কথা ভাবল কি করে এবং জনসাধারণকেই বা সৈন্যদের নিয়মশৃঙ্খলা কি করে শিখাল। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে এবং বই পড়ে জানতে পারলাম—অন্যান্য দেশের রাজাদের মত ওখানেও সময়ে উচ্চ বংশীয়েরা শক্তিমান হওয়ার জন্য, জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য এবং সম্রাট তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যের জন্য গোলযোগ করেছে। সম্রাটের পিতামহ এই গোলযোগ নিষ্পত্তি করে দেন—তারপর থেকে রাজ্যে আইন মতই চলে আসছে সকলে।

অষ্টম অধ্যায়

আমার বেশ মনে হ'ত যে, মুক্তি আমি পাবই। যদিও এটা অনুমান করা মুস্কিল ছিল যে কি উপায়ে যে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হ'তে পারে। ঝড়-ঝঞ্ঝায় তাড়িত হ'য়েই আমাদের জাহাজ এই দ্বীপের নজরের মধ্যে আসে। এটাই সর্বপ্রথম। সম্রাট আদেশ জারি করে রাখলেন, ঐ রকম আর কোনও জাহাজ দেখতে পেলে সব সুদ্ধ যেন তাঁর কাছে নিয়ে হাজির করা হয়। সম্রাটের ইচ্ছা ছিল, আমার আকারের কোন স্ত্রীলোক পেলে আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেন এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি তার রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমি কিন্তু এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিলাম। আমার সন্তান-সন্ততি ক্রীতদাসের মত হ'য়ে সকলের অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ মাথায় নিয়ে এই রাজ্যে বাস করবে—এটা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

আমার প্রাণটা দিনরাত চাচ্ছিল এমন লোকের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে যে আমার সমশ্রেণীর। এমন দেশে আমি বেড়াতে চাচ্ছিলাম, যেখানে সর্বদা ব্যাঙ বা কুকুরের বাচ্চার মত পায়ের তলায় পড়ে পিষে মরবার ভয় নেই। কিন্তু এল সেদিন—আশাতীত ভাবেই এল। সেই বিবরণই বলছি এখানে।

দু'বছর অতীত হ'য়ে গেল এই দেশে এসেছি। তৃতীয় বছরের প্রথমেই আমি আর গ্লামড্যালক্লিচ সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে রাজ্যের দক্ষিণ সীমার সমুদ্রতীরে গেলাম। আমার কোথায়ও

বেড়াবার জন্য একটা কাঠের ঘর করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা দেখতে একটা বিরাট বাক্সের মত। ওর মধ্যেই আমার বসবার এবং শোবার ব্যবস্থা ছিল।

আমাদের ভ্রমণের শেষ প্রান্তে আসার পর সম্রাট স্থির করলেন সমুদ্রের ধারে তাঁর একটা বাড়ীতে তিনি কিছুকাল বাস করবেন। গ্লামড্যালক্লিচ ও আমি উভয়েই তখন পরিশ্রান্ত। আমার সামান্য সর্দি লেগেছিল কিন্তু গ্লামড্যালক্লিচ একেবারে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ল। আমি সমুদ্র দেখতে চাইলাম। সমুদ্রকেই মনে হ'য়েছিল আমার মুক্তির একমাত্র পথ।

আমি ভাণ করলাম, যেন আমি খুবই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি। এরকম অবস্থায় আমি সমুদ্রের মুক্তবায়ু সেবন করলে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করতে পারব—এই অভিপ্রায় জানালাম। একজন রক্ষী বালককে আমার সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠান হল। হায় গ্লাম-ড্যালক্লিচ! তার যে কত দুশ্চিন্তা হ'য়েছিল আমাকে এইভাবে পাঠাতে তা আমি বেশ ভালোই জানি।

আমাকে আমার বাক্সঘরে রেখে নিয়ে গেল সেই রক্ষী বালক। তারপর আমাকে সমুদ্রতীরে রেখে বালকটি পাহাড়ে পাখির ডিম খুঁজতে বেরল। ঘরটির কাঁচের জানালা দিয়ে আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি,—হঠাৎ মনে হ'ল, আমার বাক্সঘরের উপরের আংটা ধরে যেন কে টানছে। পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম, আমার ঘরটি ভীষণ বেগে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে! আমি জোরে চিৎকার করতে লাগলাম, কিন্তু সবই বৃথা হল। আমি জানালার কাচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, খণ্ড খণ্ড মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে

না। আমার মাথার উপর পাখীর ডানার শব্দ পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারলাম, বাজ পাখীতে যেমন ছোঁ মেরে ঠোঙ্গা সুদ্ধ খাবার নিয়ে যায় এই বিরাট ঈগল পাখীটিও হয়ত আমাকে তেমনি কাছিম মনে করে ছোঁ-মেরে নিয়ে যাচ্ছে। এরা কাছিমকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে জোরে ছুঁড়ে ফেলে, তারপর তার উপরের শক্ত আবরণটা ভেঙ্গে গেলে, মাংসগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

যদিও আমার ঘরটির আবরণ প্রায় দুই ইঞ্চি পুরু শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি, তবু পাহাড়ের উপর আছাড় মারলে ওটা গুঁড়ো হতে কতক্ষণ ?—তারপর ?

অল্প সময়ের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম, উপরে ডানার ঝটপটানি হ'চ্ছে আর আমার বাক্সঘরটা ঝড়ে যে ভাবে গাছের ডাল উঁচু-নীচু হ'য়ে দোলে তেমনি দোল খাচ্ছে। উপরে একটা খণ্ড-যুদ্ধ হচ্ছে বলে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম খুব বেগে আমার বাক্সঘরটি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আমার যেন দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে বলে মনে হল। একটা বিরাট শব্দ করে আমার বাক্সটা সমুদ্রের জলে পড়ল। তারপর মিনিটখানেক সব অন্ধকার! এরপর আমার বাক্সটা ভেসে উঠল উপরদিকে। উপরের কাঁচ দিয়ে আলো এসে পড়ল ঐ বাক্স-ঘরের মধ্যে। বুঝলাম, ঈগলটি যখন আমার বাক্সঘরটা তার পায়ের নখের সঙ্গে বাঁধিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আরও দু'তিনটা ঈগল তাকে অনুসরণ করে। তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এ ঈগলটি আমাকে ফেলে দিতে বাধ্য হ'য়।

গ্লামড্যালক্লিচের কাছে যদি এখন থাকতে পারতাম! মাত্র

একঘণ্টার ব্যবধানে সে আর আমি কত—কত দূরে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি! আমার জন্য তার কত দুঃখই না হবে! সম্রাজ্ঞী অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবেন, তাকে আবার সেই গাঁয়ের বাড়ীতে তার বাবার কাছে গিয়ে বাস করতে হবে।

বাক্সবন্দী হ'য়ে সেই অসীম সমুদ্রে আমার অবস্থাটা পাঠক একবার কল্পনা করুন। যে কোনও মুহূর্তে সমুদ্রের তরঙ্গে আমার ঘর চূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে। আমি যদি বাক্সটার উপরে উঠে বসতে পারতাম তা হ'লেও কোনও সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখা যেত। আমি যে ভাবে আটকা পড়ে সমুদ্রের মাঝে ভাসছি, তাতে যদি বাক্সটির কোন ক্ষতি নাও হয়, আমি বাঁচব কি করে? ইঁদুর যেমন বাক্স-কলে পড়ে খেতে না পেয়ে মরে থাকে আমাকেও সেই ভাবে অনাহারে মরতে হবে।

এই অবস্থায় আমার ঘণ্টা চারেক কাটল। প্রতি মুহূর্তেই আমি মনে কচ্ছিলাম—এই আমার শেষ!

কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল আমার বাক্সঘরটা যেন বিশেষ একটা দিকে বেশ জোরে চলছে। একি স্রোতের টান? শব্দও যেন পাচ্ছি একটা। ঘণ্টা খানেক পরে আমার বাক্সটার সঙ্গে কিসের যেন আঘাত লাগল। পাহাড়-টাহাড় হবে হয়ত। পাথরের সঙ্গে দুই একবার আঘাত খেলেই ত বাক্সের দফা রফা!

না, যা ভেবেছিলাম তা নয়। বাক্সটা যেন উপরের দিকে একটু একটু করে উঠছে! এরপরই কে যেন বাক্সের উপরের ছিদ্রপথ দিয়ে পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় বলল, কেউ যদি ভিতরে থাকো কথা বল!

উত্তরে আমি বললাম, আমি একজন ইংরেজ, ভাগ্য বিপর্যয়ে এই দুর্দশায় পড়েছি, দয়া করে আমাকে বাঁচাও, উদ্ধার কর।

উদ্ধার কর্তা বললেন, ভয় নেই। আমি নিরাপদ! আমার বাক্সটি শক্ত করে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা হ'য়েছে। এরপর ক্যাপ্টেন এসে বাক্সের উপরে একটা পথ খুলে দিয়ে আমাকে সেই বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন।

কত ক্ষুদ্র এই সব লোক! আমাকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে এবং এলোমলো কথা বলতে শুনে অনেকে ভাবল, আমি পাগল! কেউবা হাসল। আমার মাথায় এ কথাটা কিন্তু তখনও আসেনি যে, আমি আমার নিজের মাপের লোকের মধ্যেই তখন রয়েছি।

নাবিকেরা আমাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগল। উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। এতদিন ধরে দৈত্য-মানবের দেশে থেকে মানুষকে আমার ঐ রকমই বলে মনে হ'য়েছে। নিজেকে ত' সব সময় আমি দেখতে পাইনি—আয়নার ধারে নিজের আকৃতি দেখে আমি লজ্জিত হতাম। তারপর ঐ সব লোককে স্বাভাবিক বলেই মনে হত—দৈত্য-মানব বলে আর মনে হয়নি।

আমার অবস্থা দেখে জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ টমাস উইলকক আমাকে তাঁর নিজের ক্যাবিনে নিয়ে গিয়ে তাঁর বিছানাতে ঘুমাতে বললেন।

আমি কয়েক ঘণ্টা ঘুমালাম বটে, কিন্তু গাঢ় ঘুম আমার হয়

নি—ঘুমের ঘোরে আমি অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছি কয়েকবার।

যাই হোক্—ঘুম থেকে উঠে আমি অনেকটা সুস্থ মনে করলাম। তখন রাত্রি প্রায় আটটা হবে। ক্যাপ্টেন আমার রাত্রের খাবার আনবার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁর সদয় ব্যবহারে আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হলাম।

আমাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ দেখে ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন, কি ভাবে আমি ঐ বিরাট বাক্সটার মধ্যে আটকা পড়লাম। তিনি আরও বললেন, বেলা প্রায় বারোটার সময় তিনি তাঁর দূরবীণ দিয়ে আমার ঐ বাক্সঘর দেখতে পেয়ে লোকজন নিয়ে ওটাকে জাহাজে নিয়ে আসেন।

আমি ঈগল পাখীতে ওটা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল বলতেই ওরা ভাবলেন, আমি আবার যা-তা ভুল বকতে আরম্ভ করেছি!—ক্যাপ্টেন ত' আমাকে আরও ঘুমাতে পরামর্শ দিলেন। আমি বললাম, আমি কিছু মাত্র অসুস্থ নেই এবং ভুলও বকছি না।

এরপর ক্যাপ্টেন বেশ গম্ভীর হ'য়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও ভয় নেই তোমার সত্যি কথা বল,—কোনও গুরুতর অপরাধের কথা মনে হওয়ায় তোমার মনটা বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে কিনা। তারপর তিনি বুঝিয়ে বললেন, কোন কোন দেশের রাজা গুরুতর অপরাধীকে এই রকম বাক্সে পুরে বা ছিদ্রযুক্ত নৌকায় বসিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। তাদের সঙ্গে কিছুমাত্র খাদ্যাদি দেওয়া হয় না। যাহোক, আমি যখন দৈবক্রমে উদ্ধার পেয়েছি—কোন ভয় নেই, প্রথমে তিনি যে বন্দর পাবেন, সেখানেই আমাকে

নিরাপদে নামিয়ে দেবেন। আমি যে এ ধরনের কোনও অপরাধী, তা তিনি আমার এলোমেলো কথাবার্তায়, ফ্যাল ফ্যাল চাউনিতে বুঝতে পেরেছেন !

আমি তাঁকে সবিনয়ে বললাম, আমার কথা আপনি ধৈর্য ধরে শুনুন—ওসব কিছুই নয়। তারপর আমি আমার জলযাত্রার আরম্ভ থেকে বাক্সবন্দী হওয়ার কাহিনী সমস্ত কিছু যথাযথ বললাম। ক্যাপ্টেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। আমার কথা শুনে তিনি সব বিশ্বাস করলেন। তাঁর আরও বিশ্বাস আনবার জন্য তাঁকে আমি আমার ঐ বাক্স-ঘরের চাবি দিয়ে ঐ দেশের যৎসামান্য যা আমার ঐ ঘরে ছিল তা' আনতে বললাম। ওখানে রাজার দাঁড়ির চুল থেকে তৈরি একখানি চিরুনী, চারটি বোলতার হুল, রানীর মাথার কয়েকগাছি চুল ছিল। একদিন রানী সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর কনিষ্ঠা আঙ্গুলের আংটিটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন সেটা আমার মাথার ভিতর দিয়ে গলায় পরা যেত। সেটাও ছিল ঐ বাক্সে। প্রায় একফুট লম্বা একটা দাঁত—আমি এক দাঁতের ডাক্তারের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। দাঁতটা পরিষ্কার করে ঐ ঘরেই রেখেছিলাম সেটা। সেটাও ক্যাপ্টেনকে দেখালাম।

ক্যাপ্টেন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করলেন এবং বললেন, ইংলণ্ডে গিয়ে পত্রিকায় এই সব কথা প্রকাশ করে আমি জগতকে বিস্মিত করে দিতে পারব।

ক্যাপ্টেন পরে বললেন, একটা ব্যাপার তিনি বুঝতে পারছেন না ঠিক,—আমি অত্যন্ত জোরে জোরে কথা বলি এর কারণ কি ? ওদেশের সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী কি কানে খাটো ?

এর উত্তরে আমি বললাম, বছর দুই ধরে ঐভাবে কথা বলায় আমার চেঁচিয়ে কথা বলা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। ওখানকার কেউই আমার স্বাভাবিক কথা শুনতে পেত না। আমি ফিস্ ফিস্ করে বলছি তাদের মনে হ'ত। তাই আমাকে এতদিন বেশ জোরে জোরেই কথা বলতে হ'য়েছে। ওতেই আমি অভ্যস্থ হ'য়ে পড়েছি। প্রথমটা নাবিকদের এবং রাত্রে খাবার সময় ডিসকাপগুলি দেখে আমার কেমন অদ্ভুত ঠেকেছিল তাও ক্যাপ্টেনকে বললাম। ওটাও অভ্যাসের দোষ। ক্যাপ্টেন স্বীকার করলেন, সে রাত্রে সত্যিই আমার চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

আমাদের জাহাজ অনুকূল বায়ু পেয়ে দক্ষিণ দিকে চলল। নিউ হল্যাণ্ড হয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এর পর আমরা চলতে লাগলাম। তারপর আমরা উপস্থিত হলাম উত্তমাশা অন্তরীপে। ক্যাপ্টেন মাত্র দুটি একটি বন্দরে তাঁর জাহাজ ভিড়ালেন। এখান থেকে নৌকা যোগে আহার্য ও পানীয় জল আনা হল; আমি কিন্তু জাহাজ ছেড়ে নামিনি কোথায়ও।

তারপর ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে প্রায় ন'মাস পরে এই জাহাজ ডাউন বন্দরে এল। এখানে নামবার আগে আমার জাহাজ ভাড়া বাবদ ক্যাপ্টেনকে আমার জিনিসগুলি দিয়ে যেতে চাইলাম। ক্যাপ্টেন কিছুতেই আমার ভাড়া নিলেন না। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি আমার রেড্রিফের বাড়ীতে একবার যাবেন।

পথে বেরিয়ে বাড়িঘরগুলিকে যেন কেমন ছোট বলে মনে হল আমার। গাছপালা, গরু-বাছুর সবই যেন অদ্ভুত রকম ছোট।

উল্টো কথা ভাবতে লাগলাম তখন। মনে করলাম লিলিপুটের কথা। পথে চলতে প্রতিটি মানুষ আমার পায়ের নীচে পড়ে চটকে যাবে বলে মনে হ'য়েছে! আমি প্রায়ই চিৎকার করে তাদের এক পাশে সরে দাঁড়াতে বলতাম।

যখন আমার বাড়ীতে পৌঁছলাম, একটা চাকর এসে আমাকে দরজা খুলে দিল। দরজাটা এতই ছোট মনে হ'ল যে, পাছে আমার মাথায় আঘাত লাগে এই ভয়ে আমি মাথা নীচু করে ঢুকলাম।

আমি এসেছি শুনে আমার স্ত্রী ছুটে এলেন, মেয়ে এবং চাকররাও সব এল। কি ছোট এরা! মেয়েকে হাঁটুর উপর তুলে ভাবলাম হাতের উপর তুলে নি; নিজেকে আমার কত বড়ই না মনে হ'চ্ছিল!

বাড়ীর সকলের উপর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে দেখে তারাও সেই ক্যাপ্টেনের মত মনে করল, আমার মাথাটা কিছু খারাপ হ'য়ে গেছে!

অল্পকাল মধ্যেই আমি আমার সম্বিত ফিরে পেলাম। ওদের আর ছোট বলে মনে হ'ল না আমার। আমার স্ত্রী কিন্তু জিদ ধরলেন, আমি যেন আর কখনও সমুদ্র-যাত্রায় না যাই।

—ঃ শেষ ঃ—